উপমা কালিদাসস্য

শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত,

এম্. এ, পি. আর্. এস্.

কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ

শ্রীযুত সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত মহাশয়

শ্রদ্ধাস্পদেষু।

যাঁহার নিকটে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যে
বর্ণ-পরিচয় লাভ, তাঁহারই করকমলে
উৎসর্গ করিলাম।

স্নেহাকাঙ্ক্ষী
শশিভূষণ

ভূমিকা

সাহিত্যের আসরে উপমা প্রয়োগে কালিদাস যে অদ্বিতীয় একথা আমারই যে একটা প্রকাণ্ড আবিষ্কার তাহা নহে; এ সত্যের আবিষ্কার হইয়াছে বহুপূর্বে এবং বহুপূর্ব হইতেই কাব্য-রসিকগণ এই অনন্যসাধারণতার জন্য কালিদাসকে শ্রদ্ধাঞ্জলি দিয়া আসিয়াছেন। কালিদাসের উপমা এবং তাহার ভিতর দিয়া তাঁহার কাব্য-সৌন্দর্য যে একটি বিশেষরূপে আমার নিকটে আত্ম-প্রকাশ করিয়াছে, এই ক্ষুদ্রপুস্তকে তাহারই খানিকটা পরিচয় দিতে চেষ্টা করিয়াছি।

কালিদাসের উপমা সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া উপমা শব্দটিকে আমি ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করিয়াছি। অর্থালঙ্কারের ভিতরে অধিকাংশ অলঙ্কারের মূলেই রহিয়াছে উপমা,—এইজন্য আমি তাহাদের সকলকে বুঝাইতেই সাধারণ নাম উপমা গ্রহণ করিয়াছি। এই উপমাগুলি কেন এত ভাল লাগে,—ইহাদের ভিতর দিয়া কালিদাসের কবি-প্রতিভার স্বাতন্ত্র্য কি ভাবে প্রকাশ পাইয়াছে, সে সম্বন্ধে আমার মতামত আমি গ্রন্থের ভিতরেই প্রকাশ করিয়াছি,—তাই সে-বিষয়ে এখানে কোন আলোচনার প্রয়োজন নাই। তবে আমার আলোচনা-প্রণালী সম্বন্ধে একটি কথা বলিবার আছে। এ জাতীয় গ্রন্থে পাঠক হয়ত সাধারণত একটা তুলনা-মূলক সমালোচনার আশা করেন; কিন্তু সে পন্থা অবলম্বন করিতে গিয়া আমার মনে হইতে লাগিল, এ জাতীয় তুলনা-মূলক সমালোচনায়

আলোচনাটি যেন একটা নিবিড় ঐক্যতানে জমাট বাঁধিয়া ওঠে না। তাই আমি তুলনামূলক সমালোচনার পদ্ধতি গ্রহণ করি নাই,— আলোচনাকে আমি কালিদাসের ভিতরেই সীমাবদ্ধ রাখিয়াছি।

কালিদাসের কাব্য আলোচনা করিতে বসিয়া কালিদাসের কথাই মনে পড়িয়া যাইতেছে,—

ক্ব সূর্য-প্রভবো বংশঃ ক্ব চাল্প-বিষয়া মতিঃ।
তিতীর্ষু র্দুস্তরং মোহাদুড়ুপেনাস্মি সাগরম্॥
মন্দঃ কবিযশঃপ্রার্থী গমিষ্যাম্যুপহাস্যতাম্।
প্রাংশুলভ্যে ফলে লোভাদুদ্বাহুরিব বামনঃ॥

"কোথায় সেই সূর্য-প্রভব বংশ,—আর কোথায় আমার অল্প-বিষয়া মতি! মোহবশে আমি ভেলায় দুস্তর সাগর পার হইতে ইচ্ছুক হইয়াছি! মন্দ কবিযশঃপ্রার্থী আমি শুধু লাভ করিব উপহাস,—যেমন উপহাস লাভ করে বামন প্রাংশুলভ্য ফলের জন্য হাত বাড়াইয়া।" সংস্কৃত-সাহিত্যে আমার যে অল্প-বিষয়া মতি তাহা লইয়া কালিদাসের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া নিজেই বুঝিতেছি,—আমার এ প্রয়াস নিতান্তই 'মোহাৎ';— হয়ত প্রাংশুলভ্য ফলে হাত বাড়াইয়া উপহাসই লাভ করিব; কিন্তু কালিদাসই আবার বলিয়াছেন,—

রঘূণামন্বয়ং বক্ষ্যে তনুবাগ্-বিভবোঽপি সন্।
তদ্গুণৈঃ কর্ণমাগত্য চাপলায় প্রচোদিতঃ॥
তং সন্তঃ শ্রোতুমর্হন্তি সদসদ্-ব্যক্তি-হেতবঃ।
হেম্নঃ সংলক্ষ্যতে হ্যগ্নৌ বিশুদ্ধিঃ শ্যামিকাপি বা॥

'আমার বাগ্-বিভব অতি অল্প থাকা সত্ত্বেও আমি রঘুবংশের অন্বয় বর্ণনা করিব; কারণ,—সেই রঘুবংশের গুণাবলীই আমার কর্ণে প্রবেশ করিয়া আমাকে এই চাপল্যে অনুপ্রেরিত করিয়াছে। দোষগুণের

বিচারকর্তা সজ্জনমণ্ডলীই আমার এই বর্ণনা শ্রবণ করিবেন, কারণ স্বর্ণের বিশুদ্ধি অথবা অবিশুদ্ধি অগ্নিতেই পরীক্ষিত হইয়া থাকে।” কালিদাসের সুরে সুর মিলাইতে ধৃষ্টতাজনিত অপরাধে সঙ্কুচিত হইতেছি,—কিন্তু আমার বক্তব্যও ঠিক ওই কালিদাস যাহা বলিয়াছেন তাহাই ; কালিদাসের উপমার সৌন্দর্য এবং মাধুর্য আমাকে মুগ্ধ করিয়াছে,—সেই মোহবশেই আমি তাহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি,—‘তদ্‌গুণৈঃ কর্ণমাগত্য চাপলায় প্রচোদিতঃ’! ইহার ভিতরে কতটুকু খাঁটি আর কতটুকু খাদ তাহার বিচারভার রহিল অগ্নিসদৃশ সহৃদয় পাঠকের কাছে।

পরিশেষে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের রামতনুলাহিড়ী অধ্যাপক আমার পরম শুভাকাঙ্ক্ষী রায় শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র, এম্, এ বাহাদুরের অবিচ্ছিন্ন স্নেহ, উৎসাহ ও উপদেশের জন্য তাঁহাকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ দাস গুপ্ত মহাশয়ের নিকট সংস্কৃত সাহিত্যের আলোচনায় আমি কতখানি ঋণী তাহার পরিমাণ কোন গাণিতিক উপায়ে প্রকাশযোগ্য নয় বলিয়াই আমি সে চেষ্টা হইতে এখানে বিরত রহিলাম। আমার শুভাকাঙ্ক্ষী অধ্যাপক শ্রীযুত সুধীরকুমার দাশ এম্, এ, মহাশয় নানাভাবে এই গ্রন্থপ্রকাশে আমাকে সাহায্য করিয়াছেন। কবিশেখর শ্রীযুত কালিদাস রায়, অধ্যাপক শ্রীযুত প্রিয়রঞ্জন সেন, শ্রীযুত বিশ্বপতি চৌধুরী প্রভৃতিও আমাকে নানাভাবে সাহায্য এবং উৎসাহ দান করিয়া তাঁহাদের অকৃত্রিম স্নেহের পরিচয় দিয়াছেন। বন্ধুবর শ্রীযুত রাধেশ রায় মহাশয় গ্রন্থখানির প্রকাশভার গ্রহণ করিয়া আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করিয়াছেন। যথেষ্ট সাবধানতা সত্ত্বেও ছাপায় দুই একটি ভুল রহিয়া গেল, এজন্য সহৃদয় পাঠকের নিকট ত্রুটি স্বীকার করিতেছি।

সাহিত্য-রসিকগণ মহাকবি কালিদাসের কাব্যের এই আলোচনায় কতটুকু আনন্দ লাভ করিবেন তাহা জানি না, কিন্তু এ কাব্যালোচনায় আমি নিজে যে গভীর আনন্দ লাভ করিয়াছি, তাহাই আমাকে গ্রন্থখানি প্রকাশের জন্য অনুপ্রেরিত করিয়াছে।

৬৩।১এ, প্রতাপাদিত্য রোড্,
কালিঘাট, কলিকাতা।
ফাল্গুন, ১৩৪৫ সন।

গ্রন্থকার

উপমা কালিদাসস্য

সুন্দরী নারীর সৌন্দর্য যেমন অলঙ্কারের বিচিত্র সমাবেশে এবং প্রসাধনের নৈপুণ্যে সম্যক্ বিকশিত হইয়া ওঠে, কাব্য-সুন্দরীর সৌন্দর্যও তেমনই উপমা প্রভৃতি অলঙ্কারে এবং ভাষা-প্রয়োগের নৈপুণ্যে উত্তরোত্তর বর্ধিত হইয়া ওঠে,—একথা কাব্যবিচারের আসরে বহুদিন হইতে চলিয়া আসিয়াছে; আর সংস্কৃত কাব্য-রসিকগণের নিকট এ কথাটিও খুব পরিচিত যে, উপমা প্রভৃতি অলঙ্কারের সুষ্ঠু প্রয়োগে কালিদাস যে নৈপুণ্য দেখাইয়াছেন, তাহারও আর উপমা নাই। এই পরের কথাটিই আমাদের প্রধান আলোচ্য,—কিন্তু সে বিষয়ে আলোচনা করিবার পূর্বে পূর্বের কথাটি সম্বন্ধেও একটু আলোচনা করা প্রয়োজন।

কাব্যের অলঙ্কারকে আমরা চিরদিনই সুন্দরী নারীর অলঙ্কার এবং বেশভূষার সহিত সমপর্যায়ে দেখিয়া আসিয়াছি; সুতরাং কাব্যের আস্বাদে এবং বিচারে তাহাদের স্থান যেন অনেক খানি গৌণ। বহুমূল্য অলঙ্কারে ভূষিতা নারীর ন্যায়

কাব্যসুন্দরীও অলঙ্কার প্রয়োগে একটা চমৎকারিত্ব এবং আভিজাত্য লাভ করে বটে, কিন্তু নিরাভরণা নারীর ন্যায় নিরাভরণা কাব্যসুন্দরীও যে সমাজে একেবারেই অচল একথা বলা যায় না।

অলঙ্কার সম্বন্ধে প্রচলিত মত

অলঙ্কার সম্বন্ধে এই মতটি আমরা সংস্কৃত আলঙ্কারিকগণের কাছ হইতেই উত্তরাধিকারি-সূত্রে লাভ করিয়াছি, এবং আধুনিক যুগেও যে অলঙ্কার সম্বন্ধে আমাদের এই দৃষ্টিভঙ্গির খুব বেশী একটা পরিবর্তন ঘটিয়াছে, তাহা মনে হয় না। পাশ্চাত্ত্যের Rhetoric কথাটির ভিতরেও রহিয়াছে এই গৌণত্বের সূচনা (গ্রীক Rhetor = ইংরেজী Orator = বাগ্মী)। সংস্কৃতের প্রাচীন কাব্য-বিচারকগণের মধ্যে কাব্য-বিচার সম্বন্ধে যত মতামত প্রচলিত আছে তাহার মধ্যে রসই কাব্যের আত্মা, এই মতটিই সর্বাপেক্ষা অধিক প্রাধান্য লাভ করিয়াছে, এবং বর্তমান কালেও আমাদের চিন্তাগুলি অনেকখানি এই মূল সত্যটিকে কেন্দ্র করিয়াই ঘুরিতে থাকে। কাব্য-স্বরূপ নিরূপণ প্রসঙ্গে প্রাচীন আলঙ্কারিকগণের মত উল্লেখ করিতে গিয়া 'সাহিত্য-দর্পণ'কার বিশ্বনাথ কবিরাজ বলিয়াছেন,—উক্তং হি—"কাব্যস্য শব্দার্থৌ শরীরম্, রসাদিশ্চাত্মা, গুণাঃ শৌর্যাদিবৎ, দোষাঃ কাণত্বাদিবৎ, রীতয়ো হবয়ব-সংস্থান-বিশেষবৎ, অলঙ্কারাশ্চ কটক-কুণ্ডলাদিবৎ" ইতি। অর্থাৎ—শব্দ এবং অর্থ হইল কাব্যের শরীর, রসাদি আত্মা, গুণ সমূহ কাব্য-পুরুষের শৌর্যাদির ন্যায়, দোষ কাণত্বাদির ন্যায়, রীতিসমূহ অবয়ব-সংস্থানের বৈশিষ্ট্যের ন্যায়

এবং অলঙ্কার কটক-কুণ্ডল প্রভৃতির ন্যায়। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, রসরূপ আত্মা লইয়া সুগঠিত সুস্থ-দেহ শৌর্যাদি-সম্পন্ন কাব্য-পুরুষের অঙ্গে অলঙ্কার কটক-কুণ্ডলাদির ন্যায় শোভা পাইলে অতি উত্তম ; কিন্তু না পাইলেও যে কাব্য-পুরুষ অচল তাহা নহে। সংস্কৃত সাহিত্যে এবং হিন্দী, বাঙলা প্রভৃতি আধুনিক সাহিত্যে অলঙ্কারকে অনেকস্থলে এইরূপ 'কটক-কুণ্ডলাদিবৎ' ভাবিয়া তাহাকে 'কটক-কুণ্ডলাদি'ই করিয়া তোলা হইয়াছে,—এবং এ-কথাও নিঃশঙ্কচিত্তে বলা যাইতে পারে যে, আমাদের প্রাচীন হিন্দী এবং বাঙলা সাহিত্যের অনেক স্থলে কাব্য এই কটক-কুণ্ডলাদির অভাবে নয়, বরঞ্চ বাহুল্যেই অচল হইয়া উঠিয়াছে। অবশ্য এই 'কটক-কুণ্ডলাদিবৎ' কথাটিকেও একটা গভীর অর্থে গ্রহণ করা যাইতে পারে। 'চতুরুদধিমেখলায়া ভুবোর্ভর্তা' কোনো রাজাধিরাজ যখন বহুমূল্য মণিমাণিক্য-খচিত বেশভূষায় এবং কটক-কুণ্ডলাদি অলঙ্কারে সমাবৃত হইয়া স্বর্ণ-সিংহাসনে ঝলমল করিতে থাকেন, তখন এ-কথা বলা যায় না যে এসকল অলঙ্কার তাঁহার পক্ষে অপরিহার্য নহে। তাঁহার অতুল সাম্রাজ্য, প্রবল প্রতাপ, বিপুল ধন-রত্নের প্রতীক হইয়া তাঁহাকে যদি বাহিরে অসংখ্য প্রজাপুঞ্জের নিকটে প্রকাশ পাইতে হয়, তবে তাঁহাকে এই মণিমাণিক্য-খচিত রাজ-পরিচ্ছদে এবং বহুমূল্য অলঙ্কারেই বাহির হইতে হইবে, উহা তাঁহার সম্রাট-রূপের অপরিহার্য অঙ্গ।

কিন্তু কাব্যের এই কলাকৌশলগুলিকে বাহিরের পোষাক পরিচ্ছদ এবং অলঙ্কাররূপে গ্রহণ করিলে তাহাদের গভীর তাৎপর্য এবং প্রয়োজনীয়তা সম্যক্ উপলব্ধি করা যায় না। আমার মনে হয়, অলঙ্কার-সম্বন্ধে আমাদের এই মতবাদের অনেকখানি পরিবর্তন হওয়া প্রয়োজন। এই 'অলঙ্কার' নামটিতেই আমার আপত্তি আছে। আমরা যাহাদিগকে অলঙ্কার বলিয়া কাব্যবিচারে শুধু 'কটক-কুণ্ডলে'র স্থানে বসাইয়া রাখিয়াছি, একটু গভীর ভাবে ভাবিয়া দেখিলেই দেখিতে পাইব যে, তাহারা শুধু কটক-কুণ্ডল নহে,—তাহারা মিশিয়া রহিয়াছে কাব্যদেহের অস্থিমজ্জার ভিতরে।

কাব্য-সৃষ্টির ভিতরে চিত্তের রস-সঞ্চারই যে সর্বাপেক্ষা প্রধান বস্তু তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু মানুষের আত্মার সহিত যেমন আমাদের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নাই,—তাহাকে যেমন লাভ করি আমরা তাহার দেহের ভিতর দিয়া, কাব্যের এই রস-স্বরূপতাকেও আমরা লাভ করি তাহার ভাষা ও ছন্দের লীলায়িত রূপের ভিতর দিয়া। এই বাহিরের রূপটির সহিতই আমাদের প্রত্যক্ষ কারবার, সে দেয় রস-সত্তার সন্ধান। সুতরাং কাব্যসৃষ্টির ভিতরে চিত্তের রসোপলব্ধি হইতে ভাষার ভিতর দিয়া তাহার সুষ্ঠু প্রকাশও কিছু অপ্রধান নহে। কিন্তু বিধাতা-পুরুষ মানুষকে ভাষা-সম্পদ দান করিতে গিয়া যতখানি কার্পণ্য দেখাইয়াছেন, ততখানি বোধ হয় আর কিছুতেই করেন নাই। সত্যই মানুষের দারিদ্র্য

ভাষার অক্ষমতা

সবচেয়ে বেশী ভাষার; বুকের কথা সে কিছুতেই যেন মুখে প্রকাশ করিতে পারে না। স্নিগ্ধ প্রভাতের সোনার আলোক গায়ে মাখিয়া সরোবরের ঘন কালো জলে মৃণালের বঙ্কিম গ্রীবা-ভঙ্গিতে যে কমলটি ফুটিয়া উঠে, সে যে তাহার কোন্ রূপে আমাদের চিত্ত মুগ্ধ করিয়া দেয়, হাজার কবি হাজার রকম উপায়ে তাহাকে প্রকাশ করিতে চাহিয়াছেন,— কিন্তু আজও যেন তাহার কিছুই বলা হয় নাই,—কোনও দিন তাহা বলাও হইবে না,— সে যেন তাহার চির-অকথিত রূপ। সন্ধ্যা-সকালে আকাশের গায়ে বহিয়া যায় যে রঙের লাবণ্যলীলা, কোনো কবি তাহাকে আজ পর্যন্ত ভাষায় আঁকিয়া তুলিতে পারিলেন না,—আপনার ক্ষুদ্র শিশুটিকে বুকে জড়াইয়া জাগিয়া উঠে যে মাতৃমুখের হাস্যোজ্জ্বল প্রশান্ত মহিমা বিশেষণের ঘনঘটায় তাহাকে যেন কোন দিনই প্রকাশ করা গেল না। আমাদের চারিপাশের এই যে দৈনন্দিন জীবনের পৃথিবীটি তাহার সকল রূপ-রস-শব্দ-গন্ধ-স্পর্শ লইয়া চলিয়া যাইতেছে,—ইহার প্রতি-রন্ধ্রে—প্রতি অণু-পরমাণুতে আছে যেন একটা অনির্বচনীয় রস-সত্তা,—যে আমাদিগকে নিরন্তর মুগ্ধ করিতেছে, পাগল করিতেছে—আমাদের চিত্তকে প্রকাশের বেদনায় আলোড়িত করিতেছে। কিন্তু অসহায় মানুষ! বুকের কথা আর কোন দিনই যেন মুখে প্রকাশ করা গেল না। ক্ষুদ্র একটি পল্লবের রহস্যও আজ পর্যন্ত মানুষের চিত্তের মধ্যে যতটুকু ধরা পড়িয়াছে,— ভাষায় তাহাও প্রকাশ পাইল না। কিন্তু অনাদি অতীত হইতে

চলিয়াছে সেই প্রকাশের চেষ্টা,—বিমথিত চিত্তের উন্মাদ-স্পন্দন,—তাহাতেই সৃষ্টি সকল কলা-শিল্পের—সকল কাব্য, চিত্র, ভাস্কর্য, নৃত্য এবং সঙ্গীতের। এই সকল সুকুমার চারু-শিল্প আর কিছুই নহে, ভাষার অক্ষমতাকে আভাসে ইঙ্গিতে, সঙ্গীতে ভঙ্গিতে, বিলাসে বিভ্রমে ভরিয়া তুলিবার চেষ্টা,—বুকের কথাকে প্রকাশ করিবার শতমুখী প্রয়াস।

আমাদের দৈনন্দিন ব্যবহারিক জীবনের ভাষা ও প্রকাশ-ভঙ্গি হইতে আমাদের সাহিত্যের ভাষা ও প্রকাশ-ভঙ্গি অনেকাংশে পৃথক্। এই পার্থক্যের কারণ কি? তাহার কারণ এই,—আমাদের ব্যবহারিক জীবন অপেক্ষা আমাদের কাব্যজীবনের সত্তার ভিতরে এমন গভীরতা এমন সূক্ষ্ম সৌকুমার্য রহিয়াছে, যাহাকে আমাদের নিরাভরণ গদ্য ভাষার ভিতর দিয়া এবং কথ্যরীতির ভিতর দিয়া প্রকাশ করিতে পারি না। কাব্যের যত কলা-কৌশল,—তাহার সঙ্গীত, চিত্র, অলঙ্কার কিছুই অপ্রধান বা অনাবশ্যক নহে,—সকলই রস-স্বরূপ ভাব-সত্তাকে প্রকাশের কৌশলমাত্র, ভাষাকেই কলা-কৌশলের ভিতর দিয়া প্রকাশক্ষম করিয়া তুলিবার চেষ্টা। কাব্যের ছন্দ আর কিছুই নহে, উহা ও ভাবের অনির্বচনীয়তাকে ভাষার ভিতর দিয়া প্রকাশের চেষ্টা। যাহাকে ভাষার সীমাবদ্ধ অর্থদ্বারা বুঝান যায় না,—তাহাকে সঙ্গীতের মাধুর্য এবং ধ্বনি-গাম্ভীর্যের ভিতর দিয়া, স্বর-সঙ্গতির মনোহারিত্বের ভিতর দিয়া প্রকাশ করিবার

চেষ্টা। তাই রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন,—আদি-কবি বাল্মীকির কবি-হৃদয় তমসার তীরে ক্রৌঞ্চ-মিথুনের দুঃখে এমন গভীর ভাবে বিমথিত হইয়াছিল যে, সে বেদনাকে কবি দৈনন্দিন জীবনের কোন ভাষাদ্বারাই প্রকাশ করিতে পারিলেন না,—সে বেদনা সঙ্গীতের খাত কাটিয়া আপনার স্বচ্ছন্দ প্রবাহে বাহির হইয়া আসিল ছন্দো-রূপে। কাব্যের ভিতরে যে জিনিসটিকে আমরা অলঙ্কার নামে অভিহিত করি তাহার মূল-রহস্যও ভাষাকে ভাবের প্রকাশক্ষম করিয়া তোলার মধ্যে নিহিত। সত্যকারের কবি যিনি তাঁহার ভাষার ভিতরে এই শব্দালঙ্কার বা অর্থালঙ্কার কোন আরোপিত গুণ নহে; ইহা তাঁহার ভাষার সাধারণ গুণ—স্বাভাবিক ধর্ম। অন্তরের কোনো গভীর রসানুভূতি-জনিত ভাবসম্বেগকে প্রকাশ করিতে হইলে সে ভাষাকে আপনা-আপনিই এইরূপ সঙ্গীতে ভঙ্গিতে বর্ণে চিত্রে ভরপূর হইয়া উঠিতে হইবে। ভাবের গাম্ভীর্য—তাহার অবাধ উন্মাদনা নিজের প্রকাশ লীলার গতিতেই ভাষাকে দান করে তাহার সকল সঙ্গীত এবং চিত্র। অনুভূতির প্রকাশই ভাষা-সৃষ্টির মূল কারণ, অথবা এ কথাও বলা যাইতে পারে যে ভাষা স্বরূপত অনুভূতিরই প্রকাশমানতা। আজিকার যুগে একথা কেহই বিশ্বাস করিবেন না যে, জগতে আমরা যে অসংখ্য ভাষা প্রচলিত দেখিতে পাইতেছি, তাহারা পৃথিবীর

শব্দালঙ্কার বা অর্থালঙ্কার কাব্যের ভাষার আরোপিত গুণ নহে, স্বাভাবিক ধর্ম

চারিপাশে বায়ুমণ্ডলের ভিতরেই ভাসিয়া বেড়াইতেছিল, মানুষ তাহার প্রয়োজন অনুসারে তাহাকে বাছিয়া গ্রহণ করিয়াছে। মানুষ সেই আদিম যুগ হইতে নিজের অনুভূতিকে প্রকাশ করিবার জন্য নিত্যই ভাষা সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছে। পশু-পক্ষীর ন্যায় মানুষও হয়ত কোন দিন শুধু মাত্র ধ্বনির পরিমাণ-বৈচিত্র্য এবং প্রকার-বৈচিত্র্যের ভিতর দিয়াই নিজের অন্তরের ভাব প্রকাশ করিত; অন্তরের ভাবের ভিতরে যত আসিতে লাগিল সূক্ষ্মতা, জটিলতা এবং গভীরতা,—ধ্বনির পরিমাণ-বৈচিত্র্য এবং প্রকার-বৈচিত্র্যের ভিতরেও আসিতে লাগিল ততই সূক্ষ্মতা, জটিলতা এবং গভীরতা,—ক্রমেই সৃষ্টি হইতে লাগিল ভাষার। ভাষাসৃষ্টির মূল-রহস্য সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক এবং দার্শনিক মহলে যতই মতবাদ প্রচলিত থাক না কেন,—ভাষা-সৃষ্টির মূলে অনুভূতির এই বিবিধ বৈচিত্র্যকে কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। ভাষা তাই স্বরূপত অনুভূতিরই প্রকাশ-রূপ। ধ্বনিমাত্রই অন্তর্লোকের বাহন; সে শুধু এক অন্তরের কথাকে অন্য অন্তরে পৌঁছাইয়া দেয়। ইহা যে তাহার প্রধান কাজ তাহা নহে, ইহাই তাহার একমাত্র কাজ। এক অন্তরের স্পন্দন প্রথমে রূপান্তরিত হয় বাগ্‌যন্ত্রের স্পন্দনের ভিতরে,—তাহাই আবার রূপান্তরিত হয় বাহিরের বায়ুমণ্ডলের স্পন্দনরূপে,—বায়ুমণ্ডলের স্পন্দনে স্পন্দিত হইয়া ওঠে আবার অপরের শ্রবণ-যন্ত্র,—

ভাষাসৃষ্টির মূল-রহস্য

শ্রবণ-যন্ত্রের সেই স্পন্দন মনের ভিতর দিয়া অন্তরে আনে সম-অনুভূতি। সমস্ত প্রক্রিয়াটিই একটি মাত্র স্পন্দনের রূপান্তর,—আন্তর হইতে মানসে—মানস হইতে দৈহিকে, দৈহিক হইতে বাস্তবে, আবার বাস্তব হইতে দৈহিকে, দৈহিক হইতে মানসে এবং মানস হইতে আন্তর রূপে পরিবর্তন। এমনই করিয়া একের চেতনার স্পন্দন বহু রূপান্তরের ভিতর দিয়া গিয়া সৃষ্টি করে অন্যের চেতনার ভিতরে স্পন্দন। চেতনার প্রকাশ ব্যতীত ভাষার মূলে আর কোনই সত্য নাই।

কবিকে এই ভাষার ভিতর দিয়া যে অন্তর্লোকের পরিচয় দিতে হয় তাহা তাঁহার একটি বিশেষ অন্তর্লোক,—এই অন্তর্লোকের স্পন্দন সর্বসাধারণের হৃৎস্পন্দন হইতে অনেকখানি স্বতন্ত্র,—সাধারণ ভাষার ভিতরে তাই তাহাকে বহন করিবারও শক্তি থাকে না। কবির সেই বিশেষ হৃৎ-স্পন্দন তখন গড়িয়া লয় তাহার বাহন একটি বিশেষ ভাষাকে,—সেই বিশেষ ভাষাকেই আমরা নাম দিয়াছি সালঙ্কার ভাষা। আমরা কবির কাব্যের যে সকল গুণকে সাধারণত অলঙ্কার নাম দিয়া থাকি, একটু ভাবিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিব, সেই অলঙ্কার কবির সেই বিশেষ ভাষারই সাধারণ ধর্ম মাত্র। কবির কাব্যানুভূতি ঐরূপ চিত্র, ঐরূপ বর্ণ, ঐরূপ ঝঙ্কার লইয়াই বাহিরে আত্ম-প্রকাশ করে। যেখানেই কবির বিশেষ কাব্য-রসানুভূতি বাহিরে এই বিশেষ ভাষার ভিতরে মূর্ত হইয়া

উঠিতে পারে নাই, সেখানেই আর সত্যকার কাব্য রচনা হইতে পারে নাই।

পাশ্চাত্য দার্শনিক ক্রোচে অবশ্য কাব্য-রসানুভূতিকে এইরূপে ভাষার সাহায্যে প্রকাশের ভিতরে কবির প্রকাশ-শক্তি বলিয়া স্বতন্ত্র একটা শক্তিকে স্বীকার করেন নাই। তাঁহার মতে শিল্পীর শিল্প-রসানুভূতির শক্তি (Aesthetic faculty, যাহাকে অধ্যক্ষ শ্রীযুত সুরেন্দ্রনাথ দাস গুপ্ত মহাশয় নাম দিয়াছেন 'বীক্ষাশক্তি') এবং তাহার প্রকাশ-শক্তি দুইটি স্বতন্ত্র শক্তি নহে, একই শক্তিতে এই রসানুভূতি এবং তাহার প্রকাশ-ক্রিয়া সাধিত হইয়া থাকে। তাঁহার মতে আমাদের 'বীক্ষা' এবং তাহার প্রকাশের ভিতরে রহিয়াছে একটা অদ্বয়ত্ব। যেখানে প্রকাশ নাই, সেখানে বুঝিতে হইবে সত্যকার 'বীক্ষা' বা রসানুভূতিও নাই। ক্রোচের মতে তাই সাহিত্যের রস এবং সাহিত্যের ভাষার ভিতরেও রহিয়াছে একটা অদ্বয়যোগ। যে প্রক্রিয়ায় সাহিত্যের রস আমাদের ভিতরে উন্মথিত হইয়া ওঠে, সেই প্রক্রিয়ায়ই তাহার প্রকাশ,—যে রূপে সে আমাদের চিত্তে উন্মথিত হইয়া ওঠে সেইরূপেই তাহার প্রকাশ। ক্রোচের বীক্ষা-শক্তি এবং প্রকাশ-শক্তি সম্বন্ধে এই অদ্বয়বাদ হয়ত আমরা স্বীকার নাও করিতে পারি; কিন্তু একথা ঠিক যে, কোনও বহির্বস্তুর অবলম্বনে আমাদের চিত্তের মধ্যে যখন রসোদ্রেক হয়, তখন সেই রসোদ্রেকের স্ফুটতা, সূক্ষ্মতা, গভীরতা—তাহার কমনীয়তা বা প্রচণ্ডতার ভিতরেই থাকে ভাষাময়রূপে

তাহার প্রকাশের স্ফুটতা, সূক্ষ্মতা, গভীরতা,—তাহার কমনীয়তা বা প্রচণ্ডতা। আমাদের হৃদয়ের রসোদ্রেক তখন আপনার স্বরূপকেই প্রকাশ করে ভাষার ধ্বনিমাধুর্যে, সঙ্গীতে, বর্ণ-বৈচিত্র্যে ও চিত্র-সম্পদে। ভাষার এই সকল সৌকুমার্য বাহির হইতে কিছুই 'কটক-কুণ্ডলাদি'র ন্যায় কাব্যপুরুষের দেহে জুড়িয়া দেওয়া নহে,—ইহারা কাব্যপুরুষের স্বাভাবিক দেহধর্ম।

সংস্কৃত আলঙ্কারিকগণের ভিতরেও ধ্বনিবাদিগণ অলঙ্কারের এই মুখ্যত্বকে স্পষ্টই স্বীকার করিয়াছেন। ধ্বন্যালোকে অলঙ্কার সম্বন্ধে বলা হইয়াছে,—

রসাক্ষিপ্ততয়া যস্য বন্ধঃ শক্যক্রিয়ো ভবেৎ।
অপৃথগ্‌যত্ন-নির্বর্ত্যঃ সোঽলঙ্কারো ধ্বনৌ মতঃ॥

এখানে স্পষ্টই বলা হইয়াছে, রসাক্ষিপ্ততা হেতুই অলঙ্কারের সৃষ্টি, এবং এই অলঙ্কার অপৃথগ্‌-যত্ন-সিদ্ধ, অর্থাৎ চেষ্টা করিয়া তাহাকে ভাষার ভিতরে জুড়িয়া দিতে হয় না, স্বাভাবিক কাব্যধর্মেই তাহার স্ফূর্তি।

শব্দালঙ্কার ভাষার সঙ্গীত-ধর্ম

কাব্যের এই রসসত্তা ভাষার ভিতর দিয়া প্রকাশ লাভ করিলে ভাষা যে বিশেষ গুণগুলি লাভ করে, তাহাকে আমরা সাধারণভাবে ভাষার দুইটি ধর্মে বিভক্ত করিতে পারি; একটি ভাষার সঙ্গীতধর্ম, অপরটি ভাষার চিত্র-ধর্ম। ভাষার এই সঙ্গীত-ধর্মই আত্ম-প্রকাশ করে ছন্দোরূপে এবং শব্দালঙ্কার রূপে। ছন্দ এবং

শব্দালঙ্কার উভয়েরই লক্ষ্য সঙ্গীত সৃষ্টি করা ; অর্থাৎ যে সূক্ষ্ম সুকুমারত্বকে যে বিপুল গাম্ভীর্যকে—যে অস্ফুট মনোহারিত্বকে সাধারণ ভাষার দ্বারা প্রকাশ করিতে পারা যায় না, তাহাকেই ধ্বনি-মাধুর্যের ভিতর দিয়া তাহার বিচিত্র ঝঙ্কার বা ক্বণিত নিক্কণের ভিতর দিয়া প্রকাশ করিবার চেষ্টা। 'রঘুবংশে' দেখিতে পাই, রামচন্দ্র সীতাকে লইয়া বিমান-পথে লঙ্কা হইতে অযোধ্যায় ফিরিবার কালে সমুদ্রের বর্ণনা করিতেছেন,—

দূরাদয়শ্চক্র-নিভস্য তন্বী
তমাল-তালী-বনরাজি-নীলা।
আভাতি বেলা লবণাম্বুরাশে
র্ধারানিবদ্ধেব কলঙ্করেখা॥

এখানে শব্দালঙ্কারের যে ঝঙ্কার উঠিয়াছে, তাহাতে সমুদ্রের বর্ণনা সার্থক হইয়া উঠিয়াছে। 'আ'কারের পর 'আ'কারের দ্বারা সমুদ্রের সীমাহীন বিপুলতাকে যেন ধ্বনির ভিতর দিয়াই মূর্ত করিয়া তোলা হইয়াছে। 'কুমার-সম্ভবে' উমার বর্ণনা করিতে গিয়া কবি বলিলেন,—'সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতেব'! উদ্ভিন্ন-যৌবনা উমার লাবণ্যের কমনীয়তা কিছু ছন্দে কিছু চিত্রে, কিছু ধ্বনির কমনীয়তার ভিতর দিয়া কবিকে ফুটাইয়া তুলিতে হইয়াছে। আবার অভিনন্দ কবি যেখানে ঘনান্ধকারময়ী রজনীর উদ্দাম ঝড়ের বর্ণনা করিতেছেন,—

বিদ্যুদ্দীধিতিভেদভীষণতমঃস্তোমান্তরাঃ সন্তত-
শ্যামাম্ভোধররোধসংকটবিয়দ্বিপ্রোষিতজ্যোতিষঃ।

খদ্যোতানুমিতোপকণ্ঠতরবঃ পুষ্ণন্তি গম্ভীরতাম্
আসারোদকমত্তকীটপটলীক্কাণোত্তরা রাত্রয়ঃ ॥

সেখানে গভীর অন্ধকারময়ী রজনীর ভীষণতা—তাহার ভিতরে ঝড়ের প্রচণ্ডতা যেন শব্দ-ধ্বনির ভিতর দিয়াই মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে; ঝড়ের প্রচণ্ড বেগ এবং তাহার গর্জন রহিয়াছে ছন্দের প্রবাহে, শব্দের ঝঙ্কারে। একটু গভীর ভাবে ভাবিয়া দেখিলেই দেখা যাইবে যে, এখানে শব্দালঙ্কারও শুধু 'কটক-কুণ্ডলাদিবৎ' হইয়া ওঠে নাই,—সাধারণ শব্দ এবং অর্থদ্বারা যাহাকে প্রকাশ করা যায় না, সঙ্গীতের ভিতর দিয়া ঝঙ্কারের ভিতর দিয়া তাহাকে প্রকাশ করা হইয়াছে। প্রকাশের এই কলা-কৌশলকে চেষ্টা করিয়া আনিতে হয় না,—কবির সচেতনতার ভিতরেও যে সর্বদা তাহার উৎপত্তি এমন কথাও বলা যায় না; ভোলানাথ রসসত্তার ভিতরেই নিহিত থাকে যে স্পন্দনময়ী প্রকাশ-শক্তি, এ সকল কলা-কৌশল সেই শক্তিরই বিলাস-বিভূতি মাত্র। ভাবের সূক্ষ্মতা এবং অনির্বচনীয়তার ভিতরেই লুক্কায়িত থাকে এই সকল কলা-কৌশলের প্রয়োজনীয়তা; প্রকাশের কালে ভাব তাই আপনিই ইহাদিগকে যোগার করিয়া লয়। শব্দালঙ্কার যেখানে ভাবপ্রকাশের এই স্বচ্ছন্দ গতির ভিতরেই অতি স্বাভাবিক নিয়মে জাগিয়া না ওঠে, সেখানেই তাহা একটা কৃত্রিম চাকচিক্য মাত্র হইয়া দাঁড়ায়,—সেখানে তাহাদের প্রয়োজন অপেক্ষা বাহুল্য বেশী। কবি জয়দেব যখন,—'মেঘৈর্মেদুরমম্বরং

বনভুবঃ শ্যামাস্তমালদ্রুমৈঃ' প্রভৃতি দ্বারা ঘন-মেঘজালে সমাবৃত নভোমণ্ডল এবং শ্যামল তমালতরুনিকরে অন্ধকারময় বনভূভাগের বর্ণনা দ্বারা কাব্য আরম্ভ করিলেন, সেখানে তাহার শব্দের ঝঙ্কার সার্থক। কিন্তু তিনিই যখন বসন্ত বর্ণনা আরম্ভ করিলেন,—

ললিত-লবঙ্গ-লতা-পরিশীলন-কোমল-মলয়-সমীরে।
মধুকর-নিকর-করম্বিত-কোকিলকূজিত-কুঞ্জকুটীরে॥

অথবা, উন্মদ-মদন-মনোরথ-পথিক-বধূজন-জনিত-বিলাপে।
অলিকুল-সঙ্কুল-কুসুম-সমূহ-নিরাকুল-বকুল-কলাপে॥

তখন বেশ বুঝা যায় ইহা ভাবের স্বচ্ছন্দ গতি-প্রসূত নহে, কবির সচেতন চেষ্টার ফল এবং শব্দের ঝঙ্কার এখানে অনেক খানিই যেন 'কটক-কুণ্ডলাদি'র অনাবশ্যক প্রাচুর্যে এবং ঝনৎকারে কাব্যের দেহ ও মনকে ভারাক্রান্ত করিয়া তুলিয়াছে। শব্দালঙ্কার এবং অর্থালঙ্কার লইয়া নিছক একটা অনাবশ্যক চাতুর্য দেখাইবার চেষ্টা সংস্কৃত সাহিত্যে যে কিছু কম হইয়াছে তাহা নহে,—আমাদের বাঙলা এবং হিন্দী সাহিত্যে হইয়াছে ততোধিক,—শুধু পদ্যে নয়, গদ্যেও। দেহকে স্বাস্থ্যবান্ এবং কর্মঠ করিয়া তুলিবার জন্য শরীর চর্চা করিয়া মাংস,পেশী-গুলিকে সুগঠিত করা দরকার; কিন্তু এমন একদল লোকও সংসারে দুর্লভ নহেন যাঁহারা জগতের তেমন আর বিশেষ কোন কাজেই লাগিতেছেন না, শুধু মুগুর ভাজিয়া হস্তদ্বয়ের মাংস-পেশীর পরিধিই বাড়াইতেছেন, এবং তাহা লইয়া জন-সমাজে নানাবিধ কসরৎ দেখাইয়া বাহবা লইবার চেষ্টা করিতেছেন।

কাব্যক্ষেত্রেও এই পালোয়ানী মনোবৃত্তি যে খুব কম তাহা নহে,—কিন্তু যেখানেই লেখক পরিচয় দেন এই পালোয়ানী মনোবৃত্তির সেই খানেই তিনি অকবি,—তাহার রচনাও সেখানে অকাব্য।

আমরা দেখিলাম, শব্দালঙ্কার ভাষার সঙ্গীত-ধর্মের অন্তর্গত ; ভাষার চিত্রধর্মে জাগে ভাষার অর্থালঙ্কারগুলি। অবশ্য এই চিত্রধর্ম কথাটি খুব স্পষ্ট নহে,—তাই তাহার ব্যাখ্যার প্রয়োজন। বাহিরের কোন বস্তু বা ঘটনার অনুকৃতি দ্বারা বক্তব্যকে প্রকাশ করার ধর্মকেই আমি ভাষার চিত্রধর্ম আখ্যা দিয়াছি। একটু চিন্তা করিয়া দেখিলেই দেখিতে পাইব, আমরা যাহা কিছু ভাবি বা বুঝি তাহার সবখানি না হইলেও অধিকাংশই বহির্জগতের বস্তু বা ঘটনার অনুকৃতির ছায়ায়। আমাদের জ্ঞান সম্পূর্ণই বহির্জগৎ হইতে অভিজ্ঞতা দ্বারা আমরা লাভ করিয়াছি, না ইহার ভিতরে মনের নিজস্ব সম্পদও অনেক আছে, তাহা লইয়া দার্শনিক এবং মনস্তাত্ত্বিকগণের ভিতরে যথেষ্ট তর্ক-বিতর্ক রহিয়াছে ; কিন্তু যাঁহারা জ্ঞানের ভিতরে মনের নিজস্ব-সম্পদের কথাও স্বীকার করিয়াছেন তাঁহারাও সাধারণত এই কথাই বলেন যে, জ্ঞানের মাল-মসলা সকলই সংগৃহীত হয় বহির্জগৎ হইতে। ইন্দ্রিয়ানুভূতি দ্বারা বস্তু সম্বন্ধে যে চিৎ-প্রত্যয় (Concept) লাভ হয় মন তাহার নিজের শক্তিতে তাহার ভিতরে নানাবিধ সম্বন্ধ

অর্থালঙ্কার—প্রধানত ভাষার চিত্রধর্ম

স্থাপন করিয়া লয়। কিন্তু মূলত তাহা হইলে আমাদের জ্ঞান নির্ভর করিতেছে বহির্বস্তু বা ঘটনার অনুভূতির উপরে। আজ হয়ত জ্ঞানের মাল-মসলার ভিতরে বহির্জগতের এই প্রতিচ্ছবিগুলি খুব স্পষ্ট হইয়া আর আমাদের চোখের সম্মুখে দেখা দেয় না, তাহারা হয়ত আত্ম-গোপন করিয়াছে আমাদের অবচেতন লোকে; তাই আজ হয়ত আমাদের জ্ঞান অনেকখানি শব্দ-জন্য বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু একটু বিশ্লেষণ করিলেই অবচেতন হইতে ভাষার ভিতরে বহির্বস্তু বা ঘটনার এই প্রতিচ্ছবিগুলি আবার বাহির হইয়া পড়ে। আমাদের মনের যে ভাব (idea) গুলিকে আমরা বস্তু-বিয়োজিত (abstract) বলিয়া মনে করি, তাহারাও সম্পূর্ণ বস্তু-বিয়োজিত কি না সে বিষয়েও ঘোর সন্দেহ আছে, খুঁজিলে হয়ত তাহাদের পশ্চাতেও মনের অবচেতন লোকে কিছু কিছু অস্পষ্ট প্রতিচ্ছবির সন্ধান মিলিবে।

'চিত্রধর্মে'র তাৎপর্য

মোটের উপর আমরা দেখিতে পাই আমাদের জ্ঞান-ক্রিয়া নিষ্পন্ন হয় সম্পূর্ণ না হইলেও অধিকাংশই বহির্বস্তু বা ঘটনার প্রতিচ্ছবিতে। এ জিনিসটি খুব স্পষ্ট হইয়া ওঠে যখনই আমরা আমাদের মানসিক বা আধ্যাত্মিক জগৎ সম্বন্ধে কোন কথা বলিতে যাই; এ সকল বিষয়ে কথা বলিতে হইলেই আমাদিগকে বহির্জগতের বস্তু বা ঘটনার প্রতিচ্ছবিতে বলিতে হইবে। ভাষার ভিতরে নিহিত এই যে

বহির্জগতের প্রতিচ্ছবি, তাহাই ভাষার চিত্রধর্ম। ভাষার এই চিত্রধর্মই বিস্তৃতি লাভ করিয়া সৃষ্টি করে আখ্যায়িকা এবং রূপক-কাহিনীর; বাক্যের ভিতরে তাহারা সাধারণত পরিচিত অর্থালঙ্কার রূপে; আর শব্দের ভিতরে এই চিত্রধর্ম সাধারণত নাম গ্রহণ করিয়াছে ভাষার সাধু-প্রয়োগ (idiom)। ভাষার ভিতরে এই সাধু-প্রয়োগ বলিয়া যাহা পরিচিত, তাহাদের অধিকাংশকেই বিশ্লেষণ করিলে দেখিতে পাইব তাহারা ভাষার এই চিত্রধর্ম। আমরা এক চেষ্টায় দুই কাজ সাধন করি না,

চিত্রধর্ম ও ভাষার সাধু-প্রয়োগ

'এক ঢিলে দুই পাখী মারি', নিজের কাজ নিজে না করিয়া 'আপনার চরকায় তেল দি', আমাদের হঠাৎ বিপদ আসে না, 'অকস্মাৎ বজ্রাঘাত' হয় (অবশ্য বিপদের 'আসা' ক্রিয়ার ভিতরেও চিত্রধর্ম রহিয়াছে), অপদার্থ লোকের স্বরূপ বুঝাই আমরা 'অকাল কুষ্মাণ্ড' বিশেষণের প্রয়োগে; আমরা সাধারণত 'অতি বুদ্ধির গলায় দড়ি' দিয়া থাকি; আমরা না জানিয়া আন্দাজে কাজ না করিয়া সাধারণত 'অন্ধকারে ঢিল ছুড়ি'; অপাত্রে নিস্ফল নিবেদন না জানাইয়া 'অরণ্যে রোদন' করি; আমরা মর্ম-পীড়া না দিয়া 'আঁতে ঘা' দি; (মর্ম-পীড়ার ভিতরেও আছে চিত্রধর্ম); আমরা আগুন লইয়া খেলি', কাহারো সহিত কাহার হয়ত 'আদা-কাচকলা' সম্বন্ধ, কেহ হয়ত 'আপনার নাক কাটিয়া পরের যাত্রা ভঙ্গ' করি; 'ইচোড়ে পাকিয়া' উঠি; কাহাকে দিয়া 'ইস্তক জুতা সেলাই নাগাদ চণ্ডীপাঠ' সারিয়া লই;

'উড়িয়া আসিয়া জুড়িয়া বসি', 'উড়ো খৈ গোবিন্দায় নমঃ' করি, 'উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে চাপাই, ; আমরা 'কথায় চিড়া ভিজাইতে' পারি না ; 'কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা' দি ; কাহাকেও 'কুপকাৎ' করিয়া ফেলি ; 'খাল কাটিয়া কুমীর' আনি ; 'গরজের নৌকা ডাঙ্গায়' চালাই ; 'ঘরের খাইয়া বনের মহিষ তাড়াই' ; মানুষের 'চোখে ধূলা' দিই ; কাহার হয়ত 'জলে কুমীর ডাঙ্গায় বাঘ' ; 'জাগন্ত ঘরে' হয়ত চুরি হইয়া যায় ; বিরল বস্তু আমাদের কাছে 'ডুমুরের ফুল' । 'তিলকে তাল করা', 'তেলে মাথায় তেল দেওয়া,' 'তেলে বেগুনে জ্বলিয়া ওঠা,' 'দু'নৌকায় পা দেওয়া,' 'নখ দর্পণে রাখা,' 'পান হইতে চুন খসিতে না দেওয়া,' 'বাতাসের সঙ্গে ঝগড়া করা,' 'ছাইয়ে ঘি ঢালা,' 'মাঠে মারা যাওয়া,' 'শিঙ ভাঙ্গিয়া পালে মেশা' 'হালে পানি না পাওয়া'—সর্বত্রই রহিয়াছে এই চিত্র-ধর্ম। একটু লক্ষ্য করিলেই দেখিতে পাইব, যেখানেই আমরা বক্তব্যকে সুন্দর করিয়া স্পষ্ট করিয়া বলিতে পারি সেখানেই লইয়াছি চিত্রের সাহায্য। গুণবাচক, ক্রিয়া-বাচক বা মানসিক অবস্থাবাচক শব্দগুলিকে আমরা প্রায় সর্বত্র এই চিত্রধর্মের সাহায্যে প্রকাশ করিয়া থাকি। আমাদের বিপদ 'আসে', অথবা আমাদের মস্তকে বিপদ 'পার্ত হয়',—অথবা আমরা বিপদে 'পড়িয়া যাই' ; ইহার সর্বত্রই বিপদকে আমরা বাহিরের বস্তুর প্রতিচ্ছবিতে গ্রহণ করিয়াছি। আমরা আনন্দে 'আপ্লুত' হই, দুঃখে 'নিমজ্জিত' হই, আহ্লাদে 'আটখানা' হই, বিষাদে মন 'ভাঙিয়া পড়ে',—আনন্দে 'উৎফুল্ল' হই,

নিরাশায় 'হাল ছাড়িয়া দি,'—ক্রোধে গা জ্বলে, মিষ্টি কথায় শরীর 'জুড়াইয়া' যায়। ইহার প্রত্যেকটি কথাকে বিচার বিশ্লেষণ করিলে দেখিতে পাইব, আমরা এসকল কথা অন্য কোনওরূপে প্রকাশ করিতে পারি না। মানুষের আনন্দে ভরিয়া যাওয়া মনে এমন একটা আপ্লাবন আছে,—দুঃখের ভিতরে চিত্তবৃত্তির এমন একটা নিমজ্জন আছে,—আহ্লাদে এমন একটা খণ্ড খণ্ড হইয়া যাইবার ভাব আছে,—আনন্দে এমন কুসুম-সম একটা বিকাশ আছে যে, কোনটাকেই আমরা চিত্র ব্যতীত অন্য বিশেষণের সাহায্যে বুঝাইতে পারি না। এই 'প্লাবনে'র কথা না হয় ছাড়িয়াই দিলাম ; আনন্দে যে হৃদয় 'ভরিয়া' যায় তাহাকেই বা অন্য কিরূপে আমরা প্রকাশ করিতে পারি ? এই এক 'ভরিয়া যাওয়া' ক্রিয়াটির ভিতরে রহিয়াছে দুই দিকের দুইটি চিত্র,—একটি হৃদয়ের একটা পাত্র- চিত্র, অন্যটি আনন্দের একটি তরল প্রবাহচিত্র। আমাদের মন যখন বিপদের সম্মুখীন হয় তখন এই 'সম্মুখীন হওয়া' ক্রিয়াটি বহন করে দুই পাশের সঙ্গীনধারী মন ও বিপদের ভিতরে উভয়তই একটা 'সাজ সাজ' ভাব। তারপরে আমরা কেহ চলি 'গজ গমনে', কাহারও 'অশ্বগতি', কাহারও 'মাটির শরীর', কাহারও 'শ্যেনদৃষ্টি'। 'শ্যেনদৃষ্টি' না বলিয়া যদি 'তীক্ষ্ণ' দৃষ্টি বলি তাহাতেও যে নিষ্কৃতি লাভ করিলাম এমন নহে ; দৃষ্টি তাহার 'তীক্ষ্ণতা' লাভ করিয়াছে কাহার অনুকরণে ? কোনও কিছুর উপরে আমরা দৃষ্টি 'নিক্ষেপ'

করি,—কাহারও কাহারও কথায় হয়ত কর্ণ 'পাত' করি না, 'দুরূহ' কাজে আমাদের মন 'বসে'না। আদরে আমরা 'গলিয়া পড়ি', সম্পদে মুখে হাসি 'ফোটে', বিপদে সাহস 'হারাই', কাঁদিয়া একেবারে 'ভাসাইয়া' না দিয়া যদি আমরা শুধু কাঁদিয়া 'ফেলি' চিত্রকে সেখানেও মুছিয়া ফেলিতে পারি না। হৃদয়ে আমরা আশা 'পোষণ' করি, আবার নিরাশার 'আঘাত' 'খাই'। নিরাশা যে শুধু আঘাত দিয়া ক্ষান্ত হয় তাহা নহে,—সে আঘাতকে আমাদের আবার 'খাইতে' হয়। আমাদের ভিতরে সকলেই যে 'সোজা' মানুষ এমন নহে, অনেকের আবার 'বাঁকা' মন, বাঁকা না বলিয়া 'কুটিল' বলিলেও মনের বক্র গতিকে ঢাকা যাইবে না। আমাদের ভিতরে আবার 'ছোট মন', 'বড় মন' আছে, মনের 'সঙ্কীর্ণতা' আছে, 'উদারতা' বা 'বিশালতা' আছে; তাহার ভিতরে 'নীচু'ও আছে, 'উঁচু'ও আছে। আমরা 'ছোট' কথা বলি, 'লম্বা' কথাও বলি; —'নরম' কথাও বলি 'গরম' কথাও বলি। কাজ করিয়া 'ফল' লাভ করা ছাড়া আমাদের গতি নাই। 'বিপ্লব' কথাটির প্রাথমিক অর্থটি আমরা এখন প্রায় ভুলিতে বসিয়াছি। কিন্তু আমাদের ভুলও 'ভাঙে'। অল্পে আজকাল আমাদের মন 'বিষাইয়া' যাইতেছে, —আমরা আধুনিক সাহিত্যিকেরা আবার একেবারে 'মরিয়া' (মরীয়া ?) হইয়া উঠিতে আরম্ভ করিয়াছি। উদাহরণ আর বাড়াইয়া লাভ নাই। এক কথায় বলিতে গেলে, অন্তর্লোকের কোন জাতীয় সংবাদকে বাহিরে প্রকাশ করিতে হইলেই তাহাকে

বাহিরের সাজে সাজিয়াই বাহির হইতে হইবে। এমন কি দৈহিক অনুভূতিগুলিকেও আমরা অনেক সময়ই বহির্বস্তু বা ক্রিয়ার অনুকৃতি ব্যতীত প্রকাশ করিতে পারি না। 'মাথা ধরা' রূপ যে আমাদের একটি শারীরিক বিকৃতি আছে তাহাকে আজ পর্যন্ত 'ধরা'র অনুকৃতি ব্যতীত আর অন্য কোন রূপেই প্রকাশ করা গেল না। মাথা 'কন্ কন্' করা, 'ঝিম্ ঝিম্' করা 'বোঁ বোঁ' করা, চোখ 'জ্বালা' করা, হাত পা 'কামড়ান', মাজা 'টন্ টন্' করা প্রভৃতি স্থূল দৈহিক অনুভূতিগুলিরও অনুকার ছাড়া রূপ মিলিল না। চোখ 'কট্‌মট্' করা, লাল 'টুক্‌টুক্' করা, সাদা 'ধব্ ধব্' করা প্রভৃতির ভিতরকার প্রচ্ছন্ন চিত্রের ইতিহাসটিও অনেকের চোখ এড়াইতে পারে নাই।

আধ্যাত্মিক জগতের কোন কথাই যে আমরা জাগতিক বস্তু বা ঘটনার সাহায্য ব্যতীত বলিতে পারি না তাহার প্রথম প্রমাণ এই যে আধ্যাত্মিক শব্দটির সহিত প্রারম্ভেই আমি 'জগৎ' কথাটি যোগ না করিয়া কথা বলিতে পারি নাই। ভগবান বলিতে দার্শনিকগণ বা যোগিগণের মনের মধ্যে কি চিন্তা হয় জানি না, কিন্তু আমাদের সাধারণ লোকের মনে যতই অস্পষ্ট হউক না কেন আমাদেরই ন্যায় একটি হস্তপদ-বিশিষ্ট জীবের আকৃতি-প্রকৃতি চিন্তার পটভূমিতে জাগিয়া উঠে। প্রাচীন যত ধর্মগ্রন্থ রহিয়াছে সেখানে রূপক ব্যতীত ধর্মালোচনা কোথাও জমিয়া উঠে নাই। ব্রহ্ম স্বরূপত যাহাই হৌন, মানুষ তাঁহার সহিত নিজেদের যত রকম সম্বন্ধ স্থাপন

করিয়াছে, সকলেই মানবীয় প্রেমের উপমা লইয়া। এ জিনিসটির চরম পরিণতি আমরা দেখিতে পাই বৈষ্ণব শাস্ত্রে এবং বৈষ্ণব সাহিত্যে। জীবাত্মা ও পরমাত্মার সম্বন্ধ দেখাইতে উপনিষদকেও

দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া
সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরেকং পিপ্পলং স্বাদ্বত্তি
অনশ্নন্নন্যো হভিচাকশীতি ॥

অর্থাৎ,—'দুইটি পাখী একটি বৃক্ষ অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে; তাহারা সর্বদাই একত্র বাস করে এবং পরস্পরে পরস্পরের সখা। তাহাদের মধ্যে একটি সুখে ফল ভোজন করে, অন্যে অনশন করিয়া শুধুই চাহিয়া থাকে।' —প্রভৃতির উপমা গ্রহণ করিতে হইয়াছে।

মোটের উপরে দেখিতে পাইতেছি, চিত্র যে কাব্যের ভূষণ স্বরূপ তাহা নহে,—চিত্র ব্যতীত আমাদের ভাষাই হয় না,—আমরা মনের ভাবই ব্যক্ত কবিতে পারি না। সঙ্গীত এবং চিত্রের ভিতর দিয়া আমাদের ভাষা একেবারে ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য হইয়া ওঠে; তখন সেই ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য ভাষার ভিতর দিয়া মনের জগতকে আমরা পাই প্রত্যক্ষ করিয়া,—ভাষার মারফতে এই প্রত্যক্ষ অনুভূতির ভিতর দিয়াই একটি অন্তরের রস-সম্ভার সংক্রামিত হয় অন্য চিত্তে।

ভাষার এই চিত্র ধর্ম হইতেই উৎপত্তি হয় অধিকাংশ অর্থা- লঙ্কারের। আমাদের অর্থালঙ্কারের ভিতরে যতগুলি ভাগ

আছে, তাহাদের অনেকগুলিই মূলত এক এবং তাহাদের নাম দেওয়া যাইতে পারে 'উপমা'। 'রূপক', 'উৎপ্রেক্ষা' 'ব্যতিরেক' প্রভৃতি প্রায় সকল অর্থালঙ্কারই একই কাব্য-ধর্ম এবং মানসিক প্রক্রিয়া হইতে উদ্ভূত। এই জন্যই কালিদাসের কাব্যের এই জাতীয় অর্থালঙ্কারগুলির আলোচনা প্রসঙ্গে আমি তাহাদিগকে এক উপমা নামেই অভিহিত করিয়াছি।

তাহা হইলে আমরা দেখিতে পাইলাম, কাব্যের শব্দালঙ্কার বা অর্থালঙ্কার কিছুই কাব্যের ভূষণ মাত্র নহে। কবির মনের রস-প্রেরণাকে বাহিরে প্রকাশ করিতে হইলে ভাষার ভিতরে নিরন্তরই অলঙ্কারের প্রয়োজন হয়। বস্তুতপক্ষে আমাদের শব্দের অর্থ এতখানি তাহার ধ্বনি ও চিত্র-সম্পদের উপরে নির্ভর করে যে এই সকল সঙ্গীত, ধ্বনি-মাধুর্য্য, চিত্র-সম্পদ বাদ দিয়া শব্দের একটি নিরপেক্ষ অর্থ খুঁজিয়া বাহির করা অনেক সময়ে শক্ত। কালিদাস বলিয়াছেন,—

বাগর্থাবিব সম্পৃক্তৌ বাগর্থপ্রতিপত্তয়ে।
জগতঃ পিতরৌ বন্দে পার্বতী-পরমেশ্বরৌ ॥ (১।১)

কালিদাসের মতে শব্দ ও অর্থের সম্পর্ক

অর্থাৎ 'বাক্য এবং অর্থের ন্যায় নিত্যসম্বন্ধযুক্ত জগতের জননী ও জনক পার্বতী এবং পরমেশ্বরকে বাক্য এবং অর্থের সম্যক স্ফূর্তির নিমিত্ত বন্দনা করিতেছি'। এখানে কালিদাস বাক্য বা শব্দ এবং তাহার অর্থকে পার্বতী-পরমেশ্বর বা প্রকৃতি-পুরুষের সহিত তুলনা করিয়াছেন। চিৎ-স্বরূপ

পুরুষের চেতনার স্পন্দনকে প্রকৃতি দেবী প্রকাশ করিয়া তুলিয়াছেন এই বিশ্ব-সৃষ্টির ভিতর দিয়া কত বর্ণে গন্ধে গানে! ব্যক্তি-পুরুষের চিৎ-সম্পদ—তাহার সকল অর্থপূর্ণ ভাবসম্বেগকে প্রকাশ করিতে হয় ভাষারাণীর এমনিতর বহুবিচিত্র চিত্রে বর্ণে গানে—নতুবা সে অর্থকে আর কিছুতেই সম্যক প্রকাশ করা যায় না। এইখানেই কাব্যে সকল শব্দালঙ্কার এবং অর্থালঙ্কারের সার্থকতা। রঘুবংশের দ্বিতীয় সর্গে দেখিতে পাই রাজা দিলীপ সমস্ত দিন বনে বনে বশিষ্ঠের ধেনু নন্দিনীকে চরাইয়া সন্ধ্যায় আশ্রমে ফিরিয়া আসিতেছেন,—তখন রাণী সুদক্ষিণা,—

পপৌ নিমেষালস-পক্ষ্ম-পংক্তি-
রুপোষিতাভ্যামিব লোচনাভ্যাম্ ॥ (২।১৯)

পলক-বিহীন ভাবে উপোষিত নয়নদ্বয়ের দ্বারা রাজাকে পান করিতেছিল। রাজার সহিত মুনির আশ্রমে রাণীও ব্রতচারিণী; সমস্ত দিন রাজা বনে নন্দিনীর পরিচর্যা করিয়াছেন,—ব্রত-চারিণী রাণীও রাজার অদর্শনে সমস্ত দিনে আর কোন রূপই গ্রহণ করে নাই,—তাই সমস্ত দিনে রাণীর নয়ন দু'টি উপবাস-ক্লিষ্ট এবং তৃষ্ণার্ত। রাজা যখন দিনান্তে ফিরিয়া আসিতেছিলেন তখন সুদক্ষিণার সেই উপবাসক্লিষ্ট নয়নদ্বয় তৃষ্ণার্তের মত অপলকে সেইরূপ পান করিতেছিল। রাণীর দর্শনাকাঙ্ক্ষার সমগ্র তীব্রতা মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে এই একটি মাত্র উৎপ্রেক্ষার ভিতরে। উপোষিত নয়নের দ্বারা রাণী রাজাকে শুধু

দেখিল না,—'পপৌ',—যেন পান করিতে লাগিল। এখানে অলঙ্কার শুধু 'অলঙ্কার' নহে,—রাণীর এই তীব্র ব্যাকুল দর্শন-ইচ্ছাকে প্রকাশ করিবার আর ভাষা নাই। কবিকে সাদাসিধা ভাবে

কালিদাসের উপমার সার্থকতা

বলিতে হইলে হয়ত তিনি বলিতেন,—রাণী সতৃষ্ণ নয়নে চাহিয়া রহিল; কিন্তু এই 'সতৃষ্ণ' কথাটি কি? ঐ পূর্বের উপমাটিই রহিয়াছে এই একটি কথার ভিতরে বীজাকারে।

'কুমার-সম্ভবে' দেখিতে পাই, মদনের বাণে যোগস্থ শিবের ধ্যান ভাঙিয়া গিয়াছে, মুহূর্তের জন্য যোগীশ্বর শিবের প্রশান্ত চিত্তে ঈষৎ চাঞ্চল্য আসিল। সে চাঞ্চল্যকে কালিদাস প্রকাশ করিলেন কি ভাষায়?—

হরস্তু কিঞ্চিৎপরিলুপ্তধৈর্য
শ্চন্দ্রোদয়ারম্ভ ইবাম্বুরাশিঃ।
উমামুখে বিম্বফলাধরোষ্ঠে
ব্যাপারয়ামাস বিলোচনানি॥ (৩।৬৭)

'চন্দ্রোদয়ের আরম্ভে জলরাশির ন্যায় কিঞ্চিৎপরিলুপ্তধৈর্য হইয়া মহাদেবও উমার বিম্বফলের ন্যায় অধর-ওষ্ঠের দিকে তাঁহার দৃষ্টিপাত করিলেন।' যোগীশ্বর দেবাদিদেব মহাদেবের যোগমগ্ন প্রশান্ত চিত্তের কিঞ্চিৎ চাঞ্চল্যকে ইহা অপেক্ষা আর সুন্দর করিয়া বলা যায় না। শিবের ধ্যান-সমাহিত প্রশান্ত চিত্তের ঈষৎ ধৈর্যচ্যুতি যেন চন্দ্রোদয়ের আরম্ভে বিরাট বারিধিবক্ষের ঈষৎ উদ্বেলতা! কবিকে কত সাবধানতা কত নৈপুণ্য সহকারে—

কত সূক্ষ্মভাবে শিবের এই চিত্ত-বিক্ষোভকে ভাষা দিতে হইয়াছে। চন্দ্রের উদয়ও এখন পর্যন্ত হয় নাই,—উদয়ের আরম্ভক্ষণে বিরাট অম্বুরাশির ভিতরে যে ঈষৎ চাঞ্চল্য, তাহা দ্বারাই শুধু শিবের চিত্ত-চাঞ্চল্যের একটা আভাস দেওয়া যাইতে পারে। এই যে মহেশ্বরের ঈষৎ চিত্ত-চাঞ্চল্যের সহিত চন্দ্রোদয়ের প্রারম্ভে বিশাল জলরাশির ঈষৎ আন্দোলনের তুলনা, ইহা কাব্যের কোন বেশভূষার পারিপাট্য মাত্র নহে,—এ চিত্র ব্যতীত ভাষা তাহার অর্থকেই প্রকাশ করিতে পারিত না। আমরা যাহাকে কাব্যে ভাষার সৌন্দর্য বলি, তাহা সত্য সত্য ভাষার সার্থকতা ; অর্থাৎ রসানুভূতির সমগ্রতাকে বর্ণে, চিত্রে, সঙ্গীতে যে ভাষা যত মূর্ত করিয়া তুলিতে পারিবে, সেই ভাষাই ততখানি সুন্দর এবং মধুর। আমার বিশ্বাস এই সার্থকতা ছাড়া কাব্যের ভাষার কোনও অতিরিক্ত সৌন্দর্য থাকিতে পারে না। কাব্যের সেই ভাষাই হইয়াছে তত মধুর যে ভাবকে প্রকাশ করিতে পারিয়াছে যতখানি সর্বাঙ্গীণ রূপে। এই ভাবপ্রকাশের প্রশ্নকে এড়াইয়া যেখানেই ভাষাকে শুধু অলঙ্কারে ভূষিত করিয়া তুলিবার চেষ্টা, সেখানে ভাষা যে শুধু সুন্দর হয় না তাহা নহে,—সে অলঙ্কার বিরচনা শুধু স্পষ্ট করিয়া তোলে ভাষার প্রাণহীন কুশ্রিতাকে।

'রঘুবংশে' দেখিতে পাই কালিদাস গর্ভিণী রাণী সুদক্ষিণার বর্ণনা করিতেছেন,—

শরীরসাদাদসমগ্রভূষণা
মুখেন সালক্ষ্যত লোধ্রপাণ্ডুনা।
তনুপ্রকাশেন বিচেয়তারকা
প্রভাতকল্পা শশিনেব শর্বরী॥ (৩।২)

রাণীর দেহ কিঞ্চিৎ কৃশ হইয়া গিয়াছে,—তাই আর সমগ্র ভূষণ দেহে রাখিতে পারিতেছে না,—মুখখানি ও লোধ্রকুসুমের ন্যায় পাণ্ডুতা অবলম্বন করিয়াছে; এইরূপ রাণীকে দেখিয়া মনে হইতেছে,—যেন অল্প প্রকাশিত চন্দ্রমা সহ লুপ্ততারকা প্রভাত-কল্পা যামিনী! একটি উপমা দ্বারা কালিদাস রঘুরূপ পুত্রের জননী সুদক্ষিণার রূপের যে মাধুর্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা সাধারণ ভাষায় কখনও প্রকাশ করা যায় না। উপমাটির প্রত্যেকটি পদ সার্থক। প্রথমত রাণী সুদক্ষিণা এমন একটি পুত্র প্রসব করিতে যাইতেছেন, যাহার নামে একটা রাজবংশ চিরকালের জন্য পরিচিত হইয়া থাকিবে; সেই গর্ভিণী মাতা যেন প্রভাত-কল্পা শর্বরী! সূর্যরূপ পুত্রকে গর্ভে ধারণ করিয়া আসন্ন-প্রসবা বিরাট রজনীর যে মহিমাময়ী মূর্তি, সুদক্ষিণার মূর্তিতে ফুটিয়া উঠিয়াছে সেই আসন্ন-মাতৃত্বের গৌরব,—গর্ভে তাহার রাজপুত্র রঘু। সেই আসন্ন-প্রসবা সুদক্ষিণা যখন তাঁহার বিবিধ হীরক-খচিত অলঙ্কাররাশি ত্যাগ করিয়াছে, তখন মনে হইল যেন প্রভাতকল্পা শর্বরীর দেহ হইতে তাহার অসংখ্য নক্ষত্রের অলঙ্কার খসিয়া পড়িয়াছে; আর সুদক্ষিণার লোধ্র পাণ্ডুর মুখখানি যেন ঈষৎ-দীপ্ত শেষ রজনীর চন্দ্রমা।

'রঘুবংশে'র সপ্তম সর্গে দেখিতে পাই,—বিভিন্ন দেশ হইতে সমাগত রাজন্যবর্গ ইন্দুমতীর স্বয়ম্বর সভায় তাহার মাল্য প্রার্থনায় উৎসুক হইয়া বসিয়া আছেন। রাজকন্যা মাল্যহস্তে এক এক নৃপতির সম্মুখে যাইতেই সেই সেই নৃপতির মুখ আশায় প্রদীপ্ত হইয়া উঠিতেছে; কিন্তু ইন্দুমতী অন্য রাজার সম্মুখে চলিয়া যাইতেই প্রত্যাখ্যাত নৃপতি যেন বিষাদের অন্ধকারে ডুবিয়া যাইতেছে। নৃপতিগণের এই আশা-সঞ্জীবনী এবং বিষাদ-কারিণী ইন্দুমতীকে কবি বলিলেন একটি সঞ্চারিণী দীপ-শিখা।

সঞ্চারিণী দীপশিখেব রাত্রৌ
যং যং ব্যতীয়ায় পতিম্বরা সা।
নরেন্দ্রমার্গাট্ট ইব প্রপেদে
বিবর্ণভাবং স স ভূমিপালঃ॥ (৬।৬৭)

অন্ধকার রাত্রে একটি সঞ্চারিণী দীপশিখার ন্যায় রাজকুমারী ইন্দুমতী এক এক করিয়া রাজপথবর্তী সৌধ-সমূহের ন্যায় আসীন রাজন্যবর্গের সম্মুখ দিয়া ফিরিতেছিল। প্রদীপটি যে অট্টালিকার সম্মুখে আসে, সেই অট্টালিকা যেমন ক্ষণিকের জন্য আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া ওঠে, ইন্দুমতী যে রাজার সম্মুখে যায়, মুহূর্তের জন্য সে রাজাও তেমনি আশার আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া ওঠেন, দীপশিখার ন্যায় ইন্দুমতী সম্মুখ হইতে সরিয়া যাইতেই পশ্চাতের নৃপতি বিবর্ণভাব ধারণ করেন।

যেখানেই মানুষের ভাবের ভিতরে রহিয়াছে একটু সূক্ষ্ম রমণীয়তা, একটু অনন্যসাধারণ মাধুর্য, সেইখানেই আমাদের সাধারণ

ভাষা তাহার অক্ষমতা লইয়া নীরব হইয়া যাইতে চায়, সে ভাষা আবার মুখর হইয়া ওঠে নানা চিত্র ও সঙ্গীতের ভিতর দিয়া। 'রঘুবংশে'র সপ্তম সর্গেই দেখিতে পাই, প্রবল পরাক্রান্ত রাজকুমার অজ তাহার অসামান্য রূপে রাজকুমারী ইন্দুমতীর হৃদয় জয় করিয়াছে, এবং তাহার পৌরুষবীর্যে সকল প্রতিদ্বন্দ্বী ঈর্ষ্যাপরায়ণ রাজকুমারগণকে পরাস্ত করিয়া আসিয়াছে। রাজন্যবর্গকে পরাস্ত করিয়া রাজকুমার যখন ইন্দুমতীর নিকট বিজয়গর্বে ফিরিয়া আসিয়াছে, রাজকুমারী মনে মনে খুব হৃষ্টা হইলেও কুমারীজন-সুলভ লজ্জা ও সঙ্কোচে আপনি আসিয়া সাক্ষাৎ বচনে কুমারকে অভিনন্দিত করিতে পারিল না,—সখীগণের বাক্য দ্বারা সে রাজকুমারকে তাহার সাদর অভিনন্দন জানাইল।—

হৃষ্টাপি সা হ্রী-বিজিতা ন সাক্ষাদ্
বাগ্‌ভিঃ সখীনাং প্রিয়মভ্যনন্দৎ।

কালিদাস এইখানেই থামিলেন না। কুমারী-হৃদয়ের গর্বমিশ্রিত প্রথম হর্ষকে লজ্জা-সঙ্কোচের ভিতর দিয়া চাপিয়া রাখার ভিতরে যে একটা ভাষাতীত মাধুর্য রহিয়াছে তাহা আর বর্ণনার ভিতরে সবটুকু স্পষ্ট হইয়া উঠিল না,—তখনই আসিল উপমা।—

স্থলী নবাম্ভঃপৃষতাভিবৃষ্টা
ময়ূরকেকাভিরিবাভ্রবৃন্দম্॥ (৭।৬৯)

যেমন করিয়া নব বারিধারা-পাতে অভিষিক্ত বনস্থলী আপনার মুখে প্রিয়তম নব জলধরকে স্বাগত-সম্ভাষণ জানাইতে

পারে না,—ময়ূরের কেকাধ্বনি দ্বারা সে প্রিয়তমের নিকটে তাহার ব্রীড়াকুণ্ঠিত প্রথম প্রেমের অভিবাদন জানায়!

'রঘুবংশের' অষ্টমসর্গে দেখিতে পাই, রাজকুমার অজকে রাজ্যভার বহনের উপযুক্ত দেখিয়া রাজা রঘু আত্মনির্ভরশীল এবং প্রজামণ্ডলে পরাক্রমশীল কুমারের হাতে রাজলক্ষ্মী সমর্পণ করিয়া নিজে সন্ন্যাস অবলম্বন করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন; কিন্তু সাশ্রুনয়ন পুত্রের অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া রাজ্য একেবারে ত্যাগ করিতেও পারিলেন না। রঘু তখন যতি-আশ্রম গ্রহণ করিয়া রাজনগরীর উপকণ্ঠে বাস করিতে লাগিলেন এবং অবিকৃতেন্দ্রিয় ভাবে পুত্রভোগ্যা রাজলক্ষ্মী কর্তৃক সেবিত হইতে লাগিলেন। কিন্তু এই পুত্রভোগ্যা রাজলক্ষ্মী দ্বারা সেবিত হইবার ভিতরে একটা সূক্ষ্ম চারুতা রহিয়াছে। পরিণত বয়সে পুত্রার্জিত ধনের দ্বারা সেবিত হইবার ভিতরে যে একটা কমনীয় মাধুর্য তাহাকে কবি প্রকাশ করিলেন একটি উৎপ্রেক্ষায়,—

স কিলাশ্রমমত্যন্তমাশ্রিতো
নিবসন্নাবসথে পুরাদ্বহিঃ।
সমুপাস্যত পুত্রভোগ্যয়া
স্নুষয়েবাবিকৃতেন্দ্রিয়ঃ শ্রিয়া॥ (৮।১৪)

পুত্রভোগ্যা রাজলক্ষ্মীর সেবা অবিকৃতেন্দ্রিয় রঘুর নিকটে মনে হইতেছিল আপনার পুত্রবধূরই সেবার ন্যায়!

আমরা দেখিলাম, কাব্যের ভিতরে উপমাদি অলঙ্কার বাহুল্য ত নয়ই, কাব্যের আস্বাদনে তাহাদের স্থান গৌণও

নয়, বেশ মুখ্য। কিন্তু এই উপমাদি অলঙ্কার আমাদের অন্তর্নিহিত সূক্ষ্ম গভীর ভাবগুলিকে ভাষায় প্রকাশ করিতে সাহায্য করে কি প্রকারে? এ কথাটির আলোচনা করিতে হইলে কাব্য সম্বন্ধে গোটা কয়েক মৌলিক কথারই একটু আলোচনা হওয়া দরকার।

বাহিরে যে কাব্য-লক্ষ্মীকে আমরা দেখিতে পাই শব্দে, ছন্দে, ধ্বনি-মাধুর্যে, নানাবিধ কলা-কৌশলের ভিতরে, সেই কাব্য-লক্ষ্মী আমাদের অন্তর্লোক জুড়িয়া আছে তাহার বাসনা-রূপিনী মূর্তিতে। সুদীর্ঘ জীবনের প্রতিটি নগণ্য মুহূর্তে—জন্মজন্মান্তরের প্রতি পলে পলে বিশ্বসৃষ্টির ভিতরে যেখানে লাভ করিয়াছি যাহা কিছু সুন্দর, যাহা কিছু মধুর, যাহা কিছু রমণীয়, যাহা কিছু বরণীয়, যাহা কিছু প্রেয়, যাহা কিছু শ্রেয়—তাহার কিছুই হারাইয়া যায় নাই, ইন্দ্রিয়ের দ্বার দিয়া অন্তর্লোকে প্রবেশ করিয়া তাহারা সৃষ্টি করিতেছে একটি বাসনা-লোক।

উপমার মূলরহস্য 'বাসনা'

জগতের যেখানে যাহা কিছু সুন্দর, মধুর, আমাদের মন তাহাকে তিল তিল করিয়া সংগ্রহ করিয়া গড়িয়া তুলিয়াছে এই তিলোত্তমা-সুন্দরীকে। বাহিরে আবার যখন কোনো শুভ মুহূর্তে পায় সেই সুন্দরের দেখা,—অন্তরে স্পন্দিত হইয়া উঠে বাসনা-সুন্দরীর সুকুমার বক্ষ,—সেই বাসনার উদ্রেকে খুলিয়া যায় হৃদয়ে রসের উৎস—তাহারই প্রবাহে জাগে ভাব-সম্বেগ,—তাহারই বহিঃপ্রকাশ কাব্য।

জীবনের পথে চলিতে চলিতে কখনো হয়ত দিগন্ত বিস্তৃত শ্যামল মাঠ দেখিয়া নিবিড় আনন্দ লাভ করিয়াছি,—কোন দিন হয়ত সমুদ্রের সীমাহীন প্রশান্ত বক্ষ দেখিয়া সেই সমজাতীয় আনন্দ লাভ করিয়াছি,—আবার হয়ত স্তব্ধ তুপুরের মাঝে সীমাহীন নীলাকাশের নির্মল বিস্তারের ভিতরে পাইয়াছি সেই একই জাতীয় আনন্দ। কে বলিতে পারে জ্যোৎস্না-নিশীথে প্রেয়সীর সুকুমার বক্ষের স্পর্শ-সুখের নিঃসীমতার ভিতরে ছিল না সেই দিগন্ত বিস্তৃত শ্যামল শস্য ক্ষেত্র,—সেই প্রশান্ত সাগর বক্ষ,—সেই সীমাহীন নীলাকাশের অনুভূতির নিঃসীম নিবিড়তা? চন্দ্র-তপনহীন ম্লান আকাশের গায়ে বর্ষার জলভরা মেঘের যে ছলোছলো ব্যাকুলতা দেখিয়াছি, বেত্রবনের কোল ঘেঁসিয়া ছলোছলো বহিয়া যাওয়া ঈষৎ-বঙ্কিম কালোনদীর যে ব্যাকুলতা দেখিয়াছি, আবার বিষাদ-মলিন প্রিয়ার মেঘকজ্জল অশ্রুসজল নয়ন তুইটিতে যে ব্যাকুলতা দেখিয়াছি, অন্তরে তাহার হয়ত একই জাতীয় স্পন্দন দিয়াছে। প্রতিটি অনুভূতি রাখিয়া গিয়াছে মনের বিগলিত লাক্ষাধাতুতে স্পন্দনের অঙ্কন সংস্কারের রূপে; বহুদিনের সেই সংস্কার রাশি একত্রিত হইয়া গুঞ্জরিয়া তোলে আমাদের বাসনা। সেই রাজ্যে একই অনুভূতির সূত্রে গাঁথা রহিয়াছে সমজাতীয় বহির্বস্তু বা ঘটনাগুলি,—একের সহিত অপরে রহিয়াছে যেন অবিচ্ছিন্ন ভাবে মিলিয়া মিশিয়া; একে তাই জাগাইয়া তোলে অপরের স্মৃতি। বাহিরে আজ আবার যখন নূতন করিয়া আসে নূতন দৃশ্য, গন্ধ, স্পর্শ, সঙ্গীত,—

মনের ভিতরে অবিচ্ছিন্ন ভাবে ভিড় করিয়া ওঠে যেন বাসনার মধ্যে নিহিত সেই লক্ষ অনুভূতির স্মৃতিকণা তাহাদের বাহিরের কারণের একটা অতি অস্পষ্ট আভাস-ইঙ্গিত লইয়া। আজ তাহাদের স্পষ্ট কোন রূপ নাই,—তাহারা সকলে যেন মিলিয়া মিশিয়া যায় অন্তরের একটা গভীর অনুভূতিতে। কালিদাস নিজেই এসম্বন্ধে বলিয়াছেন,—

রম্যাণি বীক্ষ্য মধুরাংশ্চ নিশম্য শব্দান্
পর্য্যুৎসুকী ভবতি যৎ সুখিতো ঽপিজন্তুঃ।
তচ্চেতসা স্মরতি নূনমবোধপূর্বং
ভাবস্থিরাণি জননান্তর-সৌহৃদানি ॥

অর্থাৎ,—'রম্য দৃশ্য দেখিয়া অথবা মধুর শব্দ শুনিয়া যে সুখী প্রাণীর চিত্তও ব্যাকুল হইয়া ওঠে, তাহার কারণ এই, জীবগণ হয়ত তখন জন্মান্তরের বাসনায় স্থিরবদ্ধ কোন সৌহার্দ্যকেই আপনার অজ্ঞাতে স্মরণ করে!' কালিদাসও বলিতেছেন,—'স্মরতি নূনমবোধপূর্বম্'—নিজের অজ্ঞাতেই অবচেতন লোকে এই স্মরণ হইয়াছে। এই অবোধপূর্ব স্মরণই বাসনার স্পন্দন। বাহিরের তন্ত্রীতে আঘাত পড়িলেই বায়ুমণ্ডলের স্পন্দন গিয়া আবার স্পন্দন তোলে হৃদয়ের বাসনা-তন্ত্রীতে। মনে তখন ইন্দ্রধনুর সূক্ষ্ম বর্ণ-বৈচিত্র্যের আভাস লইয়া জাগিয়া ওঠে যেন জন্ম-জন্মান্তরের স্মৃতি,—তাহাতেই হয় গভীর রস-সঞ্চার।

আমাদের শিল্পরসের আস্বাদনের ভিতরে সর্বত্রই থাকে একটা প্রচ্ছন্ন স্মৃতি। এই বিশ্বসৃষ্টিকে যেন কতবার কত রকম

করিয়া দেখিয়াছি। সেই সকল দেখা, সকল অনুভূতি যেন মিশিয়া আছে আমাদের দেহ-মনের অণুতে পরমাণুতে। বাহিরে আজ যাহাকে দেখিতেছি অতি ক্ষুদ্র তুচ্ছ, অন্তরে সে যে কত স্মৃতি অঙ্গে মাখিয়া কতখানি বৃহৎ হইয়া হৃদয় জুড়িয়া বসিয়া আছে তাহার খোঁজ আমরা নিজেরাই জানি না। কালিদাস যাহাকে অবোধপূর্ব স্মরণ বলিয়াছেন তাহা এই বাসনার স্মৃতি। কবি যে বিশ্ব-সৃষ্টিকে সাধারণ লোক অপেক্ষা অনেক গভীর অনেক সুন্দর করিয়া দেখেন, তাহার কারণ এই নহে যে, সাধারণ লোকের ইন্দ্রিয়-শক্তি অপেক্ষা তাঁহার ইন্দ্রিয়-শক্তি প্রবলতর; তাহার কারণ এই বাসনার তারতম্য। জগৎ এবং জীবন সম্বন্ধে কবি যে বাসনা লইয়া জন্ম-গ্রহণ করেন সে বাসনা সাধারণ লোকের বাসনা হইতে অনেক গভীর, তাই তাঁহার দৃষ্টি তাঁহার অনুভূতিও অনেক গভীর। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'কড়ি ও কোমল' কাব্য-গ্রন্থে 'স্মৃতি' কবিতাটিতে বলিয়াছেন,—

> ওই দেহপানে চেয়ে পড়ে মোর মনে
> যেন কত শত পূর্ব্ব জনমের স্মৃতি।
> সহস্র হারাণ সুখ আছে ও নয়নে,
> জন্ম-জন্মান্তের যেন বসন্তের গীতি।
> যেন গো আমারি তুমি আত্ম-বিস্মরণ,
> অনন্তকালের মোর সুখ দুঃখ শোক,
> কত নব জনমের কুসুম কানন,
> কত নব আকাশের চাঁদের আলোক।

কত দিবসের তুমি বিরহের ব্যথা,
কত রজনীর তুমি প্রণয়ের লাজ,
সেই হাসি সেই অশ্রু সেই সব কথা
মধুর মূরতি ধরি' দেখা দিল আজ।
তোমার মুখেতে চেয়ে তাই নিশিদিন
জীবন সুদূরে যেন হ'তেছে বিলীন ॥

এতখানি পূর্বস্মৃতি, এতখানি বাসনা অঙ্গে মাখিয়াই বাস্তব প্রিয়া কবির নিকট এতখানি সুন্দর এবং মধুর হইয়া ওঠে। 'চৈতালী'র 'মানসী' কবিতাটিতেও রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন,—নারীর রূপ এবং মহিমা শুধু তাহার বাস্তব সত্তার মধ্যে নাই,—নারী পুরুষের 'মানসী'।

শুধু বিধাতার সৃষ্টি নহ তুমি নারী।
পুরুষ গড়েছে তোরে সৌন্দর্য্য সঞ্চারি'
আপন অন্তর হ'তে। বসি কবিগণ
সোনার উপমাসূত্রে বুনিছে বসন।
সঁপিয়া তোমার পরে নূতন মহিমা
অমর করেছে শিল্পী তোমার প্রতিমা।
... ...
পড়েছে তোমার পরে প্রদীপ্ত বাসনা,
অর্দ্ধেক মানবী তুমি অর্দ্ধেক কল্পনা ॥

নারীর এই যে মানসী মূর্তি তাহাই তাহার বাসনাময়ী মূর্তি। কবি তাহার সম্বন্ধে যত উপমার পর উপমা দিতেছেন সে সকল

উপমাই গৃহীত তাঁহার বাসনা হইতে। বাসনার ভিতরেই সকল উপমার উৎপত্তি। কাব্যের নারী অনেকখানিই বাসমাময়ী নারী। রবীন্দ্রনাথ কাব্যের নারী সম্বন্ধে এই যে কথা বলিয়াছেন, শুধু কাব্যের নারী সম্বন্ধে নহে, কাব্যের সমগ্র জগৎ সম্বন্ধেই এই একই কথা প্রযোজ্য। কাব্যের জগৎটা বাস্তব জগৎ নহে,—উহা মানুষের মানসী সৃষ্টি,—বাসনাময়ী মূর্তি,—মানুষের স্মৃতির জগৎ।

এই স্মৃতির ভিতরে প্রকারভেদ রহিয়াছে। মানুষের অন্তরের যে গভীরতম স্মৃতি তাহাকে বলা যায় মানুষের বাসনা, সে স্মৃতি 'অবোধপূর্বম্'। এই বাসনার এক পরদা উপরে যে স্মৃতি তাহাকে আমরা নাম দিতে পারি সংস্কার; তাহাও বাসনার ন্যায় গভীর এবং অবোধপূর্ব না হইলেও সে আমাদের মনের উপরে ভাসিয়া ওঠে না। মনের উপরে ভাসিয়া ওঠে অথচ দেশকালাদি দ্বারা পরিচ্ছিন্ন নহে, এমন অস্পষ্ট স্মৃতির নাম দেওয়া যাইতে পারে 'প্রমুষ্টতত্তাক-স্মৃতি'। "প্রমুষ্ট শব্দের অর্থ অপহৃত বা লুপ্ত। তত্তা শব্দের অর্থ সেই সেই বস্তু। প্রমুষ্ট-তত্তাক-স্মৃতি বলিতে সেই স্মৃতিকে বুঝায় যেখানে স্মরণ আছে, অথচ কি স্মরণ হইল তাহার বোধ নাই। কবি যখন তাহার বাতায়নপথে উদার বিরাট মাঠের দিকে তাকাইয়া থাকেন, তখন যদি আরও যে মাঠ তিনি পূর্ব্বে দেখিয়াছেন তাহা তাঁহার মনে পড়ে তখন তাহাকে স্মরণ বলা যায়; কিন্তু যখন কোন পরিচিত মাঠের কথা স্মরণ পড়ে না, অথচ পূর্ব্বানুভূত একটি

প্রশস্ততা মনের মধ্যে ভাসিয়া উঠে, তখন তাহাকে বলা যায় প্রমুষ্টতত্তাক-স্মৃতি। এই প্রমুষ্ট-তত্তাক-স্মৃতির পিছনে থাকে সংস্কার। সংস্কার চিত্তের উপরে ভাসিয়া উঠে না, সে থাকে এক পরদা নীচে। এই সংস্কারের মধ্যে ওই রকম মাঠ দেখিয়া নানা বিচিত্র অবস্থায় নানা বিচিত্র ব্যবস্থায় সুহৃৎ-সঙ্গে জ্যোৎস্নালোকে নদীতীরে পূর্ব্বে যা কিছু আনন্দ অনুভূত হইয়াছিল তাহা সঞ্চিত হইয়া একত্র পিণ্ডীভূত হইয়া স্মৃতির ভূমিকে অব্যক্তভাবে রসপূরিত করিয়া তুলে। এই প্রমুষ্ট-তত্তাকস্মৃতি ও সংস্কারের নাম যৌথ নাম বাসন।" *

তাহা হইলে দেখিতেছি, আমাদের স্মৃতির ভিতরে গভীরতার তারতম্যে আমরা এই কয়টি ভাগ করিতে পারি; প্রথমত সাধারণ স্মরণ। মানুষের মানসিক বৃত্তিগুলির ভিতরে এমন কতগুলি ধর্ম আছে যাহা দ্বারা মন সদৃশ বস্তুর অনুভূতিকে বা কোনওরূপে পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত বস্তুর অনুভূতিকে একত্রে ধরিয়া রাখিতে পারে। মনের ভিতরে এইরূপে নানাভাবে পরস্পর সংযুক্ত হইয়া থাকে বলিয়া একটি বস্তু বা ঘটনার অনুভূতি সমজাতীয় অনুভূতিদায়ক বস্তু বা ঘটনার প্রতিচ্ছবিকে মনের ভিতরে জাগাইয়া তুলিতে পারে। ইহাই সাধারণ স্মরণ। এই সাধারণ স্মরণের পর প্রমুষ্টতত্তাক-স্মৃতি,—দেশকাল পাত্রের স্পষ্টগুণ বর্জিত একটি অস্পষ্ট স্মরণ। তাহার পরে সংস্কার,—গভীরতম স্মৃতি আমাদের বাসনা।

* সাহিত্য-পরিচয়, শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত, পৃঃ ১৪-১৫।

উপমা প্রভৃতি অর্থালঙ্কারের পশ্চাতেও রহিয়াছে কোন না কোন রকমের স্মৃতি। স্মৃতি বৈচিত্র্যে আসে অলঙ্কারের বৈচিত্র্য। সুতরাং দেখিতে পাইতেছি,—এই স্মৃতির ভিতর দিয়া উপমা প্রভৃতি অর্থালঙ্কার কাব্যের মূলধর্মের সহিতই গ্রথিত হইয়া রহিয়াছে। তাহারা 'অলঙ্কার'-স্বরূপ হইয়া কাব্যের ভূষণ বৃদ্ধি করে না,—তাহাদের ভিতর দিয়া কাব্যের রসস্বরূপই ওঠে নানাভাবে পরিপুষ্ট হইয়া।

আমরা দেখিয়াছি, ভাষার সাহায্যে আমরা যাহাকে কাব্যে রূপ দিতে চাই, তাহা একান্ত কোন বাহ্যবস্তু বা বাহ্য ঘটনা নহে,—তাহা কোন বিশেষ বহির্বস্তু বা ঘটনাকে অবলম্বন করিয়া আমাদের চিত্তের যে বাসনার উদ্রেক তাহাই। এই বাসনার কোন স্পষ্ট মূর্তি নাই,—তাই তাহাকে স্পষ্ট করিয়া কোন ভাষার সাহায্যে প্রকাশ করা যায় না। তাই যখন কোন বাসনার উদ্রেক হয় তখন আমরা যে জাতীয় বস্তুসমূহের ভিতর দিয়া এই জাতীর বাসনা লাভ করিয়াছি সেই জাতীয় সকল বস্তুর চিত্র আঁকিয়াই আবার তাহাকে বাহিরে প্রকাশ করিতে চাই। তখনই আসে উপমার পর উপমা,—উৎপ্রেক্ষার পর উৎপ্রেক্ষা, —যেন এই রকম,—কিন্তু ঠিক যে কোন্ রকম, বাসনার সে মূর্তিকে কবি নিজেই যেন প্রত্যক্ষ করিতে পারেন না। 'কাদম্বরী'র কবি শুধু 'ইব'র পরে 'ইব' বসাইয়া যাইতেছেন,— কিন্তু তবু যেন বাসনার রঙকে কিছুতেই আর বাহিরে আঁকিয়া তোলা যাইতেছে না,—কোনো রঙই যেন সেই বাসনার রঙের

সমান হইতেছে না। বহির্বস্তু বা ঘটনার অবলম্বনে কবির মনে যে বাসনা জাগিয়া ওঠে, সেই বাসনাই আবার সহৃদয় পাঠকের মনে উদ্রিক্ত হইয়া ওঠে ভাষার ভিতর দিয়া। কবি তাই সব জাতীয় চিত্রের পর চিত্র পাঠকের সম্মুখে ধরিয়া সঙ্গীতে এবং চিত্রে সেই বাসনাকে জাগাইয়া তোলেন। তখন বক্তব্য বস্তুকে অনেক বড় করিয়া বলিতে হয়,—অনেকখানি বেশী করিয়া বলিতে হয়,—অনেক বৈচিত্র্যের ভিতর দিয়া তাহার আভাস দিতে হয়। পূর্বেই দেখিয়াছি, এই চিত্রের পর চিত্র আঁকিতে কবির নূতন করিয়া সৃষ্টিকে পর্যবেক্ষণ করিতে হয় না,—সাধর্ম্যের যোগসূত্রেই তাহারা একের সহিত অপরে আসিয়া যুক্ত হয়। কবির কল্পনা তাই অনেকখানি নির্ভর করে কবির পূর্বানুভূতির উপরে। এই পূর্বানুভূতিকে বাদ দিয়া মন নূতন করিয়া কিছুই গড়িয়া পিটিয়া তৈয়ার করিয়া লইতে পারে না। এই ভাবেই সৃষ্টি সমস্ত অর্থালঙ্কারের, এইভাবেই তাহারা ভাষার দৈন্যকে অনেক পরিমাণে ঘুচাইয়া দিয়া অন্তরের বাসনার উদ্রেক-জনিত ভাবসম্বেগকে বাহিরে প্রকাশ করিতে সাহায্য করে।

সংস্কৃত অলঙ্কার গ্রন্থে আমরা যত প্রকার অর্থালঙ্কারের সন্ধান পাই, একটু ভাবিয়া দেখিলেই দেখিতে পাইব সকলের পশ্চাতে রহিয়াছে একটি মূল সত্য,—বস্তুর সহিত বস্তুর কোন না কোন সাধর্ম্য বা সামান্য-গুণ। বস্তুর প্রকৃতি-গত এই সাধর্ম্যই মনের ভিতরে সৃষ্টি করে সমজাতীয় অনুভূতি,—সেই অনুভূতিগুলির সংস্কার এবং প্রমুষ্টতত্তাক-স্মৃতি

একত্রিত হইয়া যে বাসনার সৃষ্টি করে সেই বাসনার ভিতরে সমধর্মী সকল বস্তুই সূক্ষ্ম বীজাকারে বিধৃত হইয়া থাকে,—এইখানেই মনোরাজ্যের ভিতরে এই সকল সমধর্মী বস্তুগুলির ভিতরে নিহিত থাকে একটি সূক্ষ্ম যোগসূত্র। এই সূক্ষ্ম যোগ-সূত্রটি রহিয়াছে সকল অর্থালঙ্কারের মূলীভূত কারণস্বরূপ; ইহারই নানারূপ বৈচিত্র্যে জাগিয়াছে অর্থালঙ্কারের প্রকারভেদ।

আমরা বলিয়াছি যে কবি যেখানে নারীসৌন্দর্য বর্ণনা করিতে বসেন, সে নারী কোনো বাস্তব নারী নহে,—কোনো বাস্তব নারী অবলম্বনে অন্তরে জাগিয়া ওঠে যে বাসনাময়ী নারী-মূর্তি সুরের পর সুর, রেখার পর রেখা, রঙের পর রঙ লাগাইয়া কবি তখন সেই বাসনাময়ী নারীমূর্তিকে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করেন। বিশ্বসৃষ্টির যেখানে যাহা কিছু আছে কমনীয় ও মধুর তাহাদ্বারাই চলে প্রিয়তমার রূপ-বর্ণনা। 'মেঘদূত' কাব্যের উত্তরমেঘে যক্ষ মেঘদূতকে তাহার বিরহিণী প্রিয়ার নিকট এই কথাটি বলিতে সানুবর্ন্ধ অনুরোধ করিয়া দিতেছে,—

শ্যামাস্বঙ্গং চকিতহরিণী-প্রেক্ষণে দৃষ্টিপাতং
বক্ত্রচ্ছায়াং শশিনি শিখিনাং বর্হভারেষু কেশান্।
উৎপশ্যামি প্রতনুষু নদীবীচিষু ভ্রূবিলাসান্
হন্তৈকস্মিন্ ক্বচিদপি নতে চণ্ডি সাদৃশ্যমস্তি॥ (৪৩)

অর্থাৎ,—'হে প্রিয়ে, শ্যামালতায় তোমার অঙ্গ, চকিত হরিণীর দৃষ্টিতে তোমার দৃষ্টিপাত, চন্দ্রে তোমার আনন-সৌন্দর্য, ময়ূরের পুচ্ছে তোমার কেশভার, নদীর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উর্মিমালায় তোমার

ভ্রূ-বিলাস দেখিতে চাহিয়াছি ; কিন্তু হায়,—কোন এক বস্তুতে তোমার সাদৃশ্য পাইলাম না।' যক্ষ মেঘদূতকে বলিতেছে,—এই যে আমি শ্যামালতায় আমার প্রিয়তমার অঙ্গলাবণ্যের সন্ধান করিয়াছি,—চকিত হরিণীর দৃষ্টিপাতে তাহার চঞ্চল দৃষ্টি খুঁজিয়াছি, চন্দ্রে তাহার মুখের ঔজ্জ্বল্য, ময়ূরপুচ্ছে তাহার কেশভার এবং ছোট নদীর ঢেউয়ে যে তাহার ভ্রূবিলাসের সন্ধান করিয়াছি, তাহাতেই হয়ত আমার প্রিয়তমা আমার ধৃষ্টতা দেখিয়া প্রচণ্ড রোষাবিষ্টা হইয়াছে,—কারণ ইহার কাহারই সহিত তাহার কোন অঙ্গলাবণ্যের তুলনা হয় না ; কিন্তু মেঘ তুমি তাহাকে অনুনয় করিয়া কহিও,—আমি নিজেই আমার এই এত বড় ভুলের জন্য দুঃখিত,—“হন্ত”। আমি সত্যই ইহার কোথাও তাহার অঙ্গলাবণ্যের এতটুকু খুঁজিয়া পাই নাই। এই যে বিরহী যক্ষের অলকাপুরীস্থিত বিরহী প্রিয়তমা সে অনেকখানিই যক্ষের বাসনার প্রিয়তমা। বাহিরে কোথাও যেন তাই আজ আর তাহার কোন সাদৃশ্য মেলে না,—‘কাঙ্গাল নয়ন' যেন শুধু ‘দ্বার হইতে দ্বারে' ঘুরিয়া মরে। কুমারসম্ভবে উমার রূপ বর্ণনায় কালিদাসকে কত রঙের উপর রঙ চড়াইয়া চিত্রের পর চিত্র আঁকিতে হইয়াছে।

উন্মীলিতং তূলিকয়েব চিত্রং
সূর্যাংশুভির্ভিন্নামিবারবিন্দম্।
বভূব তস্যাশ্চতুরস্রশোভি-
বপুর্বিভক্তং নবযৌবনেন॥ (১।৩২)

নবযৌবন উদ্গমে উমার যে রূপ অভিব্যঞ্জিত হইয়া উঠিল,—তাহা যেন তূলিকায় অঙ্কিত একখানি চিত্র,—নবযৌবনের স্পর্শে তাহার অঙ্গের লাবণ্য যেন সূর্যের কিরণস্পর্শে উদ্‌ভিন্ন অরবিন্দের শোভা। 'তূলিকয়েব চিত্রম্' বলিবার তাৎপর্য এই, চিত্রশিল্পী যেমন নিজের ইচ্ছামত রেখাদ্বারা বর্ণ-বৈচিত্র্যের দ্বারা নিজের মানস-সুন্দরীর রূপ দিতে পারেন, বিশ্বশিল্পী বিধাতাও যেন সেইরূপ শিল্পীর ন্যায় ধ্যান-সমাহিত হইয়া নিজের মানসী নারীকেই রেখার সূক্ষ্মতায় বর্ণের মাধুর্যে রূপ দিয়াছেন উমার ভিতরে। শকুন্তলার রূপ বর্ণনার ভিতরেও রাজা দুষ্মন্ত বলিতেছেন,—

> চিত্রে নিবেশ্য পরিকল্পিত-সত্ত্বযোগা
> রূপোচ্চয়েন মনসা বিধিনা কৃতা নু।
> স্ত্রীরত্নসৃষ্টিরপরা প্রতিভাসি সা মে
> ধাতুর্বিভুত্বমনুচিন্ত্য বপুশ্চ তস্যাঃ॥

মনে হয় বিধাতা প্রথমে ইহাকে চিত্রে আঁকিয়াছেন,—যেখানে যে রেখা, যেখানে যে বর্ণ, যেখানে যে ভঙ্গির প্রয়োজন প্রথমে সমস্তই ইচ্ছামত চিত্রে সন্নিবিষ্ট করিয়া পরে যেন সেই চিত্রকেই প্রাণদান করিয়াছেন। অথবা মনে হয় এ দেহ যেন বাস্তব কোন উপাদানেই গঠিত নয়, বিধাতা যেন প্রথমে তাঁহার শিল্প-ধ্যানে এই দেহটি দর্শন করিয়াছেন, তারপরে মানস রূপোচ্চয়ের দ্বারা মনে মনেই যেন এই অপরা স্ত্রীরত্ন সৃষ্টি করিয়াছেন। শকুন্তলা এখানে শুধু দুষ্মন্তেরই বাসনার প্রতিমূর্তি নয়,—সে যেন বিধাতা-পুরুষেরই বাসনার প্রতিমূর্তি।

'কুমারসম্ভবে' উমার রূপ বর্ণনা করিতে কবি বলিতেছেন,—উমার চরণযুগল পৃথিবীতলে বিন্যস্ত হইলে তাহার বৃদ্ধাঙ্গুলি দুইটির নখকান্তির ভিতর দিয়া যেন একটা আরক্তিম প্রভা বিচ্ছুরিত হইত,—মনে হইত যেন পৃথিবীতলে সঞ্চারমান দুইটি স্থলপদ্ম।—

অভ্যুন্নতাঙ্গুষ্ঠনখ-প্রভাভি-
র্নিক্ষেপণাদ্রাগমিবোদ্গিরন্তৌ।
আজহ্রতুস্তচ্চরণৌ পৃথিব্যাং
স্থলারবিন্দশ্রিয়মব্যবস্থাম্॥ (১।৩৩)

উমা যখন চলিত তখন, 'সা রাজহংসৈরিব সন্নতাঙ্গী।' উদ্ভিন্ন-যৌবনা কিশোরীর ঈষৎ বঙ্কিম গ্রীবাভঙ্গি যেন 'রাজহংসৈরিব সন্নতাঙ্গী'! তারপরে উমা যেদিন মহাদেবের তপোভঙ্গ করিতে করিতে চলিল, সেদিন তাহার অঙ্গে অশোককুসুম পদ্মরাগমণিকে ভর্ৎসনা করিয়াছিল, কর্ণিকার পুষ্প স্বর্ণের দ্যুতি কাড়িয়া লইয়াছিল,—সিন্ধুবার পুষ্পের দ্বারা তাহার মুক্তার মালা গাঁথা হইয়াছিল,—এইরূপে বসন্তের পুষ্পসম্ভার অঙ্গে বহন করিয়া উমা পথ চলিতেছিল।

অশোকনির্ভৎর্সিতপদ্মরাগ-
মাকৃষ্টহেমদ্যুতিকর্ণিকারম্।
মুক্তাকলাপীকৃতসিন্ধুবারং
বসন্তপুষ্পাভরণং বহন্তী॥ (৩।৫৩)

এই 'বসন্তপুষ্পাভরণং বহন্তী' কথাটার ভিতরে যেন একটা

বাচ্যার্থের সহিত সুকুমার ধ্বনি বাজিয়া উঠিয়াছে। অশোক, কর্ণিকার এবং সিন্ধুবারে সজ্জিত উমাত 'বসন্তপুষ্পাভরণং বহন্তী' বটেই ;—কিন্তু তাহার সঙ্গে সঙ্গেই যেন ধ্বনিত হইয়া ওঠে অঙ্গে অঙ্গে নব যৌবনের বসন্তের ফুল ! শকুন্তলার বর্ণনায়ও কবি বলিয়াছেন,—কুসুমের ন্যায় যৌবন যেন শকুন্তলার প্রতি অঙ্গে অঙ্গে।—

অধরঃ কিশলয়রাগঃ
কোমলবিপটপানুকারিনৌ বাহূ।
কুসুমমিব লোভনীয়ং
যৌবনমঙ্গেষু সন্নদ্ধম্ ॥

অধর যেন নবোদ্গত পল্লবের তরুণিমা,—বাহুযুগল যেন কোমল বিটপ,—আর কুসুমের ন্যায় প্রস্ফুট যৌবন যেন সমস্ত অঙ্গে বাঁধা পড়িয়া রহিয়াছে।

উমা যখন বসন্তপুষ্পাভরণে ভূষিতা হইয়া সঞ্চরণ করিতেছিল তখন মনে হইতেছিল,—

আবর্জিতা কিঞ্চিদিব স্তনাভ্যাং
বাসো বসানা তরুণার্করাগম্।
পর্যাপ্তপুষ্পস্তবকাবনম্রা
সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতেব ॥ (৩।৫৪)

স্তনদ্বয়ের ভারে ঈষৎ অবনমিতা তরুণ অরুণবৎ রক্ত-বর্ণ বস্ত্র পরিহিতা পার্বতী যেন প্রচুর পুষ্পস্তবকে অবনম্র একটি সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতা! উৎপ্রেক্ষাটির সমগ্র ধ্বনিটিই যে অতি

মনোহর তাহা নহে,—ইহার প্রত্যেকটি শব্দও সার্থক। এক-দিকে নব যৌবনের স্তনভারে একটুখানি নুইয়া-পড়া উমা, অন্য দিকে পর্যাপ্তপুষ্পের স্তবকভারে আনম্রা লতা; একদিকে উমার বসনের তরুণার্করাগ,—অন্যদিকে 'পল্লবিনী'র নব কিশলয়ের আরক্তিম বর্ণচ্ছটা; আর গতিশীলা উমার তন্বী অঙ্গের ভঙ্গিমা, যেন সঞ্চারিণী পল্লবিনীর লাস্য-ভঙ্গি!

মহেশ্বর কর্তৃক প্রত্যাখ্যাতা হইয়া উমা তাহার নবযৌবনের রূপ সম্ভারকে নিজেই নিজের অন্তরে নিন্দা করিয়াছিল। নিজের 'অবন্ধ্যরূপতা'র জন্য পার্বতী কঠোর তপস্বিনী মূর্তি ধারণ করিলেন। তখন পুনরায় গ্রহণের ইচ্ছায় যেন উমা তাহার দেহের সকল রূপ-মাধুর্য এক একটি বস্তু বা প্রাণীর কাছে রাখিয়া গেল।

পুনর্গ্রহীতুং নিয়মস্থয়া তয়া
দ্বয়েঽপি নিক্ষেপ ইবার্পিতং দ্বয়ম্।
লতাসু তন্বীষু বিলাসচেষ্টিতং
বিলোলদৃষ্টিং হরিণাঙ্গনাসু চ॥ (৫।১২)

তন্বী লতিকার নিকট উমা গচ্ছিত রাখিল তাহার বিলাস বিভ্রম,—চঞ্চলা হরিণীর নিকট রাখিয়া গেল চোখের দুইটি চঞ্চল চাহনি।

বিবাহের পূর্বে সখীগণ কর্তৃক সজ্জিতা পার্বতী—

সা সম্ভবদ্ভিঃ কুসুমৈর্লতেব
জ্যোতির্ভিরুদ্যদ্ভিরিব ত্রিযামা।

সরিদ্বিহঙ্গৈরিব লীলমানৈ-
রামুচ্যমানাভরণা চকাশে॥ (৭।২১)

নানা আভরণে ভূষিতা উমা যেন একটি কুসুমিতা লতা,—যেন নক্ষত্রোদ্ভাসিত রজনী, যেন বিহঙ্গ-শোভিত একটি তটিনী!

অভিজ্ঞান-শকুন্তলে দেখিতে পাই,—আলবালে জল-সেচন নিরতা শকুন্তলাকে অনসূয়া বলিতেছে,—'হলা সউন্দলে তুবত্তো বি তাদকস্‌সবস্‌স ইমে অস্‌সমরুক্‌খা পিঅদরে ত্তি তক্কেমি, জেণ ণোমালিআ-কুসুম-পেলবা বি তুমং এদাণং আলবালপূরণে ণিউত্তা।'—অর্থাৎ, শকুন্তলা, আমার মনে হয়, এই আশ্রম বৃক্ষগুলি তোমা অপেক্ষাও তাত কাশ্যপের প্রিয়তর; যেহেতু, নবমালিকা-কুসুম-পেলবা তুমিও ইহাদের আলবাল-পূরণে নিযুক্ত হইয়াছ। অনসূয়ার এই একটি মাত্র পরিহাস-বচনের ভিতর দিয়া যেন নবযৌবনা শকুন্তলার 'ণোমালিআ-কুসুমপেলবা' রূপটি উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। ইহার পরক্ষণেই দেখিতে পাই, শকুন্তলা বলিতেছে,—সখি অনসূয়ে,—প্রিয়ংবদা অতি শক্ত করিয়া বল্কল বাঁধিয়া দিয়াছে, একটু শিথিল করিয়া দাও। প্রিয়ংবদা ঈষৎ হাসিয়া উত্তর করিয়াছিল, আপন উদ্ভিন্ন-যৌবনকে তিরস্কার কর! এই শকুন্তলাইত 'সরসিজমনুবিদ্ধং শৈবলেনাপি রম্যম্!' বল্কল-পরিহিতা শকুন্তলা সম্বন্ধে রাজা দুষ্যন্ত বলিয়াছেন,—

সরসিজমনুবিদ্ধং শৈবলেনাপি রম্যং
মলিনমপি হিমাংশোর্লক্ষ্ম লক্ষ্মীং তনোতি।

ইয়মধিকমনোজ্ঞা বল্কলেনাপি তন্বী
কিমিব হি মধুরাণাং মণ্ডনং নাকৃতীনাম্॥

শৈবালের দ্বারা আবৃত হইলেও কমল রম্য; পূর্ণিমাচন্দ্রের শোভা কলঙ্কচিহ্ন স্পর্শেও বিকাশ লাভ করে; কিন্তু 'ইয়মধিকমনোজ্ঞা বল্কলেনাপি তন্বী',—শকুন্তলার তন্বী দেহখানি যেন বল্কলে আবৃত হইয়া অধিক মনোজ্ঞ হইয়া উঠিয়াছে! স্বভাবসুন্দর বস্তু যে নিরাভরণ হইয়া অসজ্জিত স্থানে থাকিয়াও শুধু আপন সৌন্দর্য রক্ষা করে তাহা নহে, অযত্ন রক্ষিতভাবে বিজাতীয় বস্তুর সংস্পর্শে তাহার স্বভাব-সৌন্দর্য যেন একটা অপূর্ব চারুতাই লাভ করে। মনের পটভূমিতে সেখানে থাকে যেন একটা পরস্পর তুলনাজনিত তারতম্যের বোধ,—সেই তারতম্যেই যেন সে অধিক মনোজ্ঞ হইয়া ওঠে। কোথায় কুসুমপেলব শকুন্তলার নবযৌবনের দুর্লভ তনু,—আর কোথায় তরুলতাবৃত মুনির আশ্রম—কোথায় বল্কল পরিধান,—জলপূর্ণ কলসীভারে পীড়িত হইয়া আলবালে জল-সেচন! কিন্তু তবু মনে হয়, নগরের উদ্যান-লতা হইতে 'ইয়মধিক মনোজ্ঞা!'

'কুমার-সম্ভবে' জটাবল্কলধারিণী উমা সম্বন্ধেও কবি বলিয়াছেন,—

যথা প্রসিদ্ধৈর্মধুরং শিরোরুহৈ-
র্জটাভিরপ্যেবমভূত্তদাননম্।
ন ষট্‌পদশ্রেণিভিরেব পঙ্কজং
সশৈবলাসঙ্গমপি প্রকাশতে॥ (৫।৯)

উমার আনন প্রসিদ্ধ কেশগুচ্ছে যেমন মধুর শোভা পাইত,—জটাতেও তেমনই শোভা পাইতেছিল; পদ্ম যে শুধু ভ্রমর সঙ্গেই শোভা পায় তাহা নহে,—শৈবল সহযোগেও তাহার শোভা প্রকাশ পায়।

দুষ্যন্তের স্মরণে জাগ্রতা মনোময়ী শকুন্তলা যেন একটি অনাঘ্রাত পুষ্প, যেন নখ দ্বারা অচ্ছিন্ন কিশলয়,—যেন অনাবিদ্ধ রত্ন, যেন অনাস্বাদিতরস মধু,—যেন পুণ্যরাশির মূর্তিমান্ অখণ্ড ফল!

অনাঘ্রাতং পুষ্পং কিশলয়মলূনং কররুহৈ-
রনাবিদ্ধং রত্নং মধু নবমনাস্বাদিতরসম্।
অখণ্ডপুণ্যানাং ফলমিব চ তদ্রূপমনঘং
ন জানে ভোক্তারং কমিহ সমুপস্থাস্যতি॥

ইহা শুধু ফুলের সহিত, কিশলয়ের সহিত, রত্ন বা মধুর সহিত শকুন্তলার তুলনা মাত্র নহে,—প্রত্যেকটি উপমার পশ্চাতে রহিয়াছে রাজার উন্মথিত বাসনার স্পন্দন। শকুন্তলার রূপ দুষ্যন্তের চক্ষে যেন বিশ্বের কামনার প্রতিমূর্তি,—সে পরম লোভনীয়া। শকুন্তলার সৌন্দর্যের সমগ্র লোভনীয়তা উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে এই উপমানগুলির বিশেষণ কয়টির ভিতর দিয়া, সে যেন অনাঘ্রাত পুষ্প,—অচ্ছিন্ন কিশলয়,—অনাবিদ্ধ রত্ন,—অনাস্বাদিত রস মধু।

'মালবিকাগ্নিমিত্র' নাটকে মালবিকার রূপ সম্বন্ধে রাজা অগ্নিমিত্র বলিতেছেন,—পাণ্ডুগণ্ডস্থল এবং পরিমিত আভরণ সহ মালবিকা যেন—

মাধব-পরিণত-পত্রা কতিপয়কুসুমেব কুন্দলতা।

যেন বসন্তের পাণ্ডুর পরিণত পত্র এবং কয়েকটি ফুল লইয়া একটি কুন্দলতা। অন্যত্রও অগ্নিমিত্র মালবিকা সম্বন্ধে বলিতেছেন,—

অনতিবিলম্বিদুকূলনিবাসিনী
লঘুভিরাভরণৈঃ প্রতিভাতি মে।
উড়ুগণৈরুদয়োন্মুখচন্দ্রিকা
হৃতহিমৈরিব চৈত্র-বিভাবরী॥ (৫।৩৫)

মালবিকা অনতিবিলম্বী দুকূল বসন পরিহিতা,—অল্প আভরণে সজ্জিতা, দেখিয়া মনে হয় যেন উদয়োন্মুখ মুখচন্দ্রিকা লইয়া কতিপয় নক্ষত্রে ভূষিতা তুহিন-বিহীন মধুযামিনী। উদয়োন্মুখ চন্দ্রের আননে শোভাময়ী মধুযামিনীর সহিত শুভ্র দুকূল বসন পরিহিতা পরিমিত ভূষণা যুবতী নারীর রহস্যময়ী মূর্তি আমাদের বাসনার ভিতরে ডুবিয়া আছে এক হইয়া,—তাই কাব্যে সেই বাসনার রূপায়ণের ভিতরেও তাহাদিগকে আমরা পাই এমন অবিচ্ছিন্ন করিয়া। সহৃদয় পাঠকও এই সমধর্মা ছবি একের পর এক যত দেখিবেন, ততই আসিবে তাঁহার বাসনার ভিতরে স্পন্দন,—ততই হইবে তাঁহার অন্তরে রসোদ্রেক,—ততই হইবে তাঁহার কাব্যাস্বাদ সার্থক।

এই যে উপমার পর উপমা, উৎপ্রেক্ষার পর উৎপ্রেক্ষা, ব্যতিরেকের পর ব্যতিরেকের সমাবেশ করিয়া কবি সুন্দরী নারীর দেহ-সুষমার পরিচয় দিতে চেষ্টা করিয়াছেন, তথাপি

কবির তৃপ্তি নাই,—তথাপি কবি কখনও একথা বলিতে পারেন না যে, সুন্দরী নারীর দর্শনে তাঁহার মনের রাজ্যে যে বাসনার নারীমূর্তিটি জাগিয়া ওঠে তাহাকে তিনি কখনও প্রকাশ করিতে পারিয়াছেন। কালিদাস পারেন নাই,—সমগ্র জগতের লক্ষ লক্ষ কবি একত্র হইয়াও তাহা পারেন নাই; আজও তাই শত সহস্র নূতন নূতন উপমার সাহায্যে চলিয়াছে সে একই চেষ্টা —অন্তরের সেই বাসনাময়ী নারীকে কোনও রূপে বাহিরে আভাসে ইঙ্গিতে প্রকাশ করা।

'রঘুবংশে' দেখিতে পাই, রামচন্দ্রকে প্রসব করিবার পর কৃশোদরী কৌশল্যা রামচন্দ্রকে শয্যার পাশে রাখিয়া শায়িত আছে; দেখিয়া মনে হয়, শরতের ক্ষীণা জাহ্নবী যেন শ্বেত সৈকতের প্রস্ফুট পদ্মের উপহার সহ শোভা পাইতেছে।

শয্যাগতেন রামেণ মাতা শাতোদরী বভৌ।
সৈকতাম্ভোজবলিনা জাহ্নবীব শরৎকৃশা॥ (১০।৬৯)

আঁকিয়া বাঁকিয়া বহিয়া যাওয়া শরতের ক্ষীণ স্রোতস্বিনীর শুভ্র সৈকতে ঈষৎ রক্তাভ প্রস্ফুট পদ্মকলিটি দেখিয়া কবি যে আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন, তাহা যেন সদ্যঃপ্রসূত রক্তিমাভ শিশুটিকে বুকের কাছে রাখিয়া শুভ্র শয্যায় ক্ষীণ শিথিল অঙ্গ এলাইয়া দিয়া শায়িতা মাতৃমূর্তি হইতে লব্ধ আনন্দেরই সহোদর। সহৃদয় পাঠকচিত্তেও যদি সমজাতীয় বাসনা থাকে তবে পরস্পরসম্বদ্ধ দুইটি চিত্রে সেই বাসনা উদ্রিক্ত হইয়া তাহাকেও রসধারে আপ্লুত করিয়া দিবে।

'রঘুবংশে'র অন্যত্র দেখিতে পাই, শ্রীরামচন্দ্র সীতাকে বলিতেছেন,—

আসার-সিক্ত-ক্ষিতি-বাষ্পযোগাৎ
মামক্ষিণোদ্ যত্র বিভিন্ন-কোশৈঃ।
বিড়ম্ব্যমানা নবকন্দলৈস্তে
বিবাহধূমারুণ-লোচন-শ্রীঃ॥ (১৩।২৯)

বর্ষার নববারিপাতে ধরণীর গাত্র হইতে জাগিয়া উঠিতেছে বাষ্পের ধূম, আর ধরণীর গায়ে দলগুলি ভিন্ন করিয়া বিকশিত হইয়াছে অরুণবর্ণের নবীন কন্দলী ফুল। ধরণীর গাত্র হইতে উত্থিত বাষ্পধূমে আবৃত অরুণবর্ণ নবদলভেদী কন্দলী ফুলগুলি দেখিয়া রামচন্দ্রের শুধু মনে পড়িতেছিল বিবাহের যজ্ঞধূমে অরুণাভ সীতার কোমলপক্ষ্মভেদী চক্ষু দুইটি। ধরণীর বাষ্প-ধূমে আবৃত এবং ঈষৎ-ক্লিষ্ট অরুণাভ কন্দলী ফুলগুলির ভিতরে একটা নবীন লাবণ্য—একটা রসস্যাবৃত মহিমা আসিয়াছে, কারণ, এই বাষ্পধূমের পশ্চাতে রহিয়াছে নবীন মেঘের নবতম বর্ষণ,—যাহা ধরণীর তৃষিত বুকে আনিয়াছে নবতম শীতল স্পর্শ,—যাহা সূচিত করিতেছে শ্রাবণের ঘনবর্ষণ—যাহাতে ধরণীর বুকে আনিবে নিবিড় শ্যামলতা—মাঠে মাঠে আনিবে নূতন শস্য—তরুলতায় আনিবে নবীন ফলফুল। বিবাহধূমে অরুণায়িত পক্ষ্মদ্বয়ের ভিতরে উন্মীলিত সীতার চক্ষুদ্বয়ের মধ্যেও রহিয়াছে এই জাতীয় একটা অপরূপ রহস্যময়ী শোভা,—একটা অকথিত মহিমা; কারণ বিবাহ-ধূমের পশ্চাতেও

রহিয়াছে যে প্রেম-তৃষিত কুমারী জীবনের একটা নবতম তৃপ্তি,—তাহার ভিতরে সূচনা রহিয়াছে দাম্পত্য জীবনের ফলপুষ্প শোভিত পরিণতির। রামচন্দ্রের মনের ভিতরে এই দুইটি দৃশ্যই জাগায় সম-অনুভূতি,—একে তাই স্মরণ করাইয়া দেয় অপরকে।

আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি, আমাদের স্মৃতির ভিতরেও একটা গভীরতার তারতম্য আছে। আমাদের সকল উপমাই যে বাসনার অতলতলে শিকর গাড়িয়া আছে একথা বলা যায় না,—অনেক সময় হয়ত উপমা আসে আমাদের সাধারণ স্মৃতি হইতে। আমরা দেখিয়াছি,—সমজাতীয় বস্তুকে মনের ভিতরে বিধৃত করিয়া রাখিবার আমাদের মনের একটা ক্ষমতা আছে; আবার আমাদের চিত্তবৃত্তির ভিতরে এমনও একটা ধর্ম রহিয়াছে যাহার ফলে একটি বস্তুর অনুভূতি তাহার সহিত যুক্ত অন্যান্য অনুভূতিগুলিকেও মনের ভিতরে জাগাইয়া তুলিতে পারে, ইহাকেই বলে স্মরণ। বহির্বস্তুর অনুভূতিগুলি যে শুধু বস্তু-সাদৃশ্যের ভিতর দিয়াই মনে বিধৃত থাকে এমন কথা বলা যায় না; কার্য-কারণ, অঙ্গঅঙ্গী, শেষশেষী প্রভৃতি রূপেও বস্তুর ভিতরে আছে যে পরস্পর সম্বন্ধ, সেই সূত্রেও বস্তুর অনুভূতি অনেক সময় আমাদের মনে এক হইয়া থাকে। বস্তুর ভিতরকার এই শেষোক্ত সম্বন্ধ সৃষ্টি করে আমাদের অর্থান্তর-ন্যাস প্রভৃতি অলঙ্কারের।

উপমায় আনু-পাতিক সম্বন্ধ

বস্তু সম্বন্ধে দেহগত সাদৃশ্য ব্যতীত গুণকর্মের সাদৃশ্য দ্বারা তাহারা আমাদের মনের ভিতরে যখন যুক্ত থাকে তখন

সর্বদাই তাহাদের ভিতরে থাকে একটা উপমান সম্বন্ধ (Relation of Analogy)। দুই বস্তুর গুণ বা কর্ম যেখানে সমান জাতীয় সেইখানেই মনের ভিতরে তাহারা একত্রে গ্রথিত হইয়া থাকে তাহাদের রূপগত সকল বৈসাদৃশ্য সত্ত্বেও। এই জন্যই আলঙ্কারিকগণ উপমান এবং উপমেয়ের ভিতরে যে সাদৃশ্যের কথা বলিয়াছেন, তাহার নাম দিয়াছেন সাধর্ম্য বা সামান্য গুণ। 'কুমার-সম্ভবে' কালিদাস বলিলেন,—

তাং হংসমালাঃ শরদীব গঙ্গাং
মহৌষধিং নক্তমিবাত্মভাসঃ।
স্থিরোপদেশামুপদেশকালে
প্রপদিরে প্রাক্তন-জন্ম-বিদ্যাঃ॥ (১।৩০)

হংসমালা যেমন শরতের গঙ্গায় আপনি উড়িয়া আসে,— রজনীর মহৌষধিতে দীপ্তি যেমন স্বতঃ প্রকাশিত হয়,—তেমনই প্রাক্তন-জন্মের বিদ্যা উপদেশকালে মেধাবিনী উমাকে আশ্রয় করিল। এখানে উপমাটিকে যদি আমরা বিশ্লেষণ করি তাহা হইলে দেখিতে পাইব,—সমস্ত চিত্রগুলির ভিতরে যোগসূত্র দান করিয়াছে একটা উপমান সম্বন্ধ। সে সম্বন্ধটিকে আমরা এইরূপে বিশ্লেষ করিতে পারি,—শরতের নদীর পক্ষে হংসমালা যাহা, রজনীর মহৌষধির পক্ষে স্বয়ংপ্রকাশ জ্যোতি যাহা, উপদেশ কালে মেধাবিনী উমার পক্ষে স্বতঃস্ফূর্তিও তাহাই। শরৎ গঙ্গার সহিত হংসমালার যে সম্বন্ধ, জ্যোতির সহিত

রজনীর ওষধীর যে সম্বন্ধ, মেধাবিনী উমার সহিত প্রাক্তনবিদ্যার সম্বন্ধ ঠিক তাহাই। গাণিতিক উপায়ে আমরা ইহাকে বলিতে পারি একটা আনুপাতিক সম্বন্ধ, এবং গাণিতিক সূত্রে তাহাকে আমরা প্রকাশ করিতে পারি এইরূপে—

শরতের গঙ্গা : হংসমালা	}	উপদেশকালে স্থিরোপদেশা
রজনীর মহৌষধি : আত্মভাস	}	উমা : প্রাক্তন-জন্ম-বিদ্যা

এখানে উমাটির সার্থকতা প্রধানত নির্ভর করিবে এই আনুপাতিক সম্বন্ধের উপরে। এই সম্বন্ধটি যত নির্ভুল, যত সুষ্ঠু, যত সর্বাঙ্গসুন্দর হইবে উপমাটিও ততই সুন্দর হইবে। উপরের উদাহরণেই দেখিতেছি,—শরতের গঙ্গায় যে হংসমালা উড়িয়া আসে তাহা যেমন স্বাভাবিক নিয়মে,—রাত্রিতে ওষধির প্রজ্বলন যেমন স্বতঃস্ফূর্ত, মেধাবিনী উমার চিত্তে প্রাক্তন-বিদ্যাও তেমনই স্বতঃস্ফূর্ত। এখানে স্বাভাবিক বিধানে এই স্বতস্ফূর্তিই আনুপাতিক সম্বন্ধ। উমার চিত্তে প্রাক্তন বিদ্যার স্বতস্ফূর্তি শরতের গঙ্গায় হংসমালার আগমন এবং রজনীর ওষধিতে আত্মভাসের ভিতর দিয়া অতি সুষ্ঠুভাবে প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়াই উপমাটি সার্থক। এখানে আরও দেখিতে পাই,—এই আনুপাতিক সম্বন্ধটি ব্যতীতও শরতের গঙ্গার সহিত তন্বী উমার এবং শুভ্র হংসমালা এবং ওষধির স্বয়ংদীপ্তির সহিত শুভ্রোজ্জ্বল বিদ্যার একটা সুকুমার সাদৃশ্য রহিয়াছে,—এই সাদৃশ্য-মাধুর্য এবং আনুপাতিক সম্বন্ধের সুষ্ঠুতা সমগ্র উপমাটিকে সার্থক-মহিমা দান করিয়াছে।

এই আনুপাতিক সম্বন্ধের ভিতরে মূলের মাহাত্ম্যই যেখানে বড় হইয়া যায়, সেখানেই হয় 'ব্যতিরেক, 'অধিকারূঢ়-বৈশিষ্ট্য' প্রভৃতি অলঙ্কার। 'কুমার-সম্ভবে'ই দেখিতে পাই, বিবাহের পূর্বে পুরনারীগণ উমার গৌরবর্ণ অঙ্গে শুক্ল অগুরু মার্জনা করিয়া তাহাতে গোরোচনা দ্বারা পত্রাঙ্কিত করিয়া দিতেছে। উমার সেই গোরোচনার পত্রাঙ্কন শ্বেতসৈকতে চক্রবাক শোভিতা হইয়া প্রবাহিতা গঙ্গার লাবণ্যকেও হার মানাইয়া ছিল।—

বিন্যস্তশুক্লাগুরুচক্রুরঙ্গং
গোরোচনা-পত্রবিভক্তমস্যা।
সা চক্রবাকাঙ্কিতসৈকতায়া-
স্ত্রিস্রোতসঃ কান্তিমতীত্য তস্থৌ॥ (৭।১৫)

এখানে দেখিতেছি, গৌরীর শুক্ল-অগুরুমার্জিত অঙ্গে গোরোচনার পত্রাঙ্কনের সম্বন্ধ এবং গঙ্গার শ্বেতসৈকতে চক্রবাকের সম্বন্ধের ভিতরেও কবি আবার তারতম্য করিয়াছেন,— 'অতীত্য তস্থৌ'।

কালিদাসের উপমার চমৎকারিত্ব এই অনুপাতিক সম্বন্ধের নিপুণ সংস্থাপনে। রূপের সাদৃশ্যে, গুণকর্মের এই আনুপাতিক সম্বন্ধের নিপুণ সংস্থাপনে বক্তব্য বিষয়টি যেন মধুর হইতে মধুরতর, গভীর হইতে গভীরতর হইয়া উঠে। বস্তুর সহিত বস্তুর বা ঘটনার সহিত ঘটনার সম্বন্ধের ভিতরে অনেক সময়েই এমন একটা চারুতা থাকে যে, তাহাকে এই জাতীয় নানারূপ আনুপাতিক সম্বন্ধের ভিতরে না ফেলিয়া যেন আমরা ভাল

করিয়া বুঝিতে পারি না। উমা যখন মহাদেবের নিকটে প্রত্যাখ্যাতা হইয়া একেবারে মরমে মরিয়া গৃহে ফিরিয়া চলিতেছিল, তখন পিতা হিমালয় আসিয়া কন্যাকে বুকে তুলিয়া লইলেন।

সপদি মুকুলিতাক্ষীং রুদ্র-সংরম্ভভীত্যা
দুহিতরমনুকম্পামদ্রিরাদায় দোর্ভ্যাম্।
সুরগজ ইব বিভ্রৎ পদ্মিনীং দন্তলগ্নাং
প্রতিপথগতিরাসীদ্ বেগদীর্ঘীকৃতাঙ্গঃ॥ (৩।৩৭)

হিমালয় হঠাৎ আসিয়া দুইবাহু প্রসারণ পূর্বক রুদ্রকোপানল ভয়ে নিমীলিত-নয়না অনুকম্পাযোগ্যা কন্যাকে তুলিয়া লইলেন, এবং সুরগজ যেমন দন্তলগ্ন নলিনীকে লইয়া গমন করে, সেইরূপই দীর্ঘপাদবিক্ষেপে দেহ বিস্তৃত করিয়া প্রস্থান করিলেন। নগাধিরাজ হিমালয়ের দুই হাতে উমা যেন সুরগজের দন্তে লগ্না কমলিনী! আনুপাতিক সম্বন্ধটির ভিতরে একটি সুমধুর কমনীয়তা আছে। কর্কশদেহ ধূসরবর্ণ বিরাট হস্তীটির দন্তে যেমন করিয়া ক্ষুদ্র কোমল কমলিনী শোভা পায়, হিমালয়ের ধূসর বন্ধুর বিরাট বক্ষে কোমলাঙ্গী তন্বী উমা তেমন করিয়াই শোভা পাইয়াছিল। শুধু তাহাই নহে,—বলবান বিরাট হস্তীর যে শুণ্ডের আঘাতে বৃহৎ বনস্পতিগুলি মুহূর্তে ভগ্ন হইয়া যায়,—সমস্ত বন্য পশু যাহার ভয়ে ভীত ত্রস্ত, সেই ভীষণ বলবান হস্তীর ধূসর কর্কশ দেহের অভ্যন্তরে রহিয়াছে এমন একটা কোমল স্নেহ,—যে স্নেহের বশে সে অতিশয় কমনীয় কমলটিকেও

এত যত্নে এবং আদরে শুণ্ডে করিয়া লয়, যাহাতে একটি কোমল পাপড়িতেও এতটুকু আঘাত লাগিতে না পারে,—বিরাট হিমালয়ের বুকে উমাও ঠিক তেমনই। যে বিরাট হিমালয় মুহূর্তে কত জনপদ নিশ্চিহ্ন করিয়া দিতে পারে,—দাবাগ্নিতে কত বনস্পতি, কত জীবজন্তু ধ্বংস করিয়া দিতে পারে, কত প্লাবন বহাইতে পারে, কত নদনদীর প্রবাহ বন্ধ করিয়া দিতে পারে,—তাহার বুকে পিতৃস্নেহের করুণা কত মধুর!

'রঘুবংশে' দেখিতে পাই,—স্বয়ংবর সভায় প্রতিহারিণী সুনন্দা রাজকন্যা ইন্দুমতীকে এক রাজকুমারের নিকট হইতে অন্য রাজকুমারের নিকটে লইয়া যাইতেছে। কবি বলিলেন,—

তাং সৈব বেত্র-গ্রহণে নিযুক্তা
রাজান্তরং রাজসুতাং নিনায়।
সমীরণোত্থেব তরঙ্গলেখা
পদ্মান্তরং মানসরাজহংসীম্॥ (৬।২৬)

বেত্রধারিণী প্রতিহারিণী রাজকন্যাকে এক রাজার নিকট হইতে অন্য রাজার নিকটে লইয়া যাইতেছিল,—যেমন সমীরণোত্থিত তরঙ্গলেখা রাজহংসীকে পদ্ম হইতে পদ্মান্তরে লইয়া যায়। উপমাটিকে বিশ্লেষণ করিলে প্রথম সার্থকতা মনে হয় ইহার আনুপাতিক সম্বন্ধের সুষ্ঠুতায়। রাজকন্যাকে প্রতিহারিণী যে এক রাজকুমার হইতে অন্য রাজকুমারের নিকটে আগাইয়া দিতেছে, সে যেন সমীরণের মৃদু আঘাতে উত্থিত তরঙ্গের ঈষৎ আন্দোলনে মানস-বিহারিণী মরালীকে পদ্ম হইতে পদ্মান্তরে

আগাইয়া দেওয়া। তারপরে 'রাজসুতা' ইন্দুমতী এখানে 'মানস-রাজহংসী'! সে যেন রাজন্যবর্গের মানসের নবতম প্রণয়াকাঙ্ক্ষানীরে রাজহংসীর ন্যায়ই বঙ্কিম ভঙ্গিতে ঈসৎলাস্যে বিচরণ করিতেছে,—একটুখানি আনন্দলীলার চাঞ্চল্যে সে এখান হইতে ওখানে সরিয়া যাইতে পারে। নবযৌবনে প্রস্ফুট এক একটি রাজকুমার যেন এক একটি প্রস্ফুট পদ্ম। আর প্রতিহারিণীও এখানে সমীরণোত্থিত তরঙ্গলেখা;—সে চলিয়াছে তাহার সখীজনোচিত আনন্দ, কৌতূহল ও ঈষৎ লাস্যে, তাই সে সমীরণোত্থিত তরঙ্গলেখা! এই আনুপাতিক সম্বন্ধ,—প্রতি বস্তুর এই গুণকর্ম এবং রূপের সাদৃশ্য,—সকল একত্রিত হইয়া জাগাইয়া তোলে একটি রমণীয় রসধ্বনি।

শ্রীরামচন্দ্র যখন সীতাকে পুনরুদ্ধার করিয়া লঙ্কা হইতে অযোধ্যায় ফিরিলেন তখন আনন্দোৎসবে সমগ্র অযোধ্যা নগরী ভরিয়া উঠিল। তখন—

> প্রসাদ-কালাগুরুধূমরাজি-
> স্তস্যা পুরো বায়ুবশেন ভিন্না।
> বনান্নিবৃত্তেন রঘূত্তমেন
> মুক্তা স্বয়ং বেণীরিবাবভাসে॥ (১৪।১২)

সেই অযোধ্যা পুরীর প্রাসাদ হইতে উত্থিত কৃষ্ণ অগুরুর ধূমরাশি বায়ুবশে ভিন্ন হইয়া যাইতেছিল; মনে হইতেছিল, বন হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া রঘূত্তম রাম যেন স্বয়ং আসিয়া অযোধ্যা সুন্দরীর কাল বেণী মুক্ত করিয়া দিয়াছেন। রাজভোগ্যা

রাজনগরীর সহিত রাজার সম্বন্ধটি কান্তাসম্মিত। রামচন্দ্র সুদীর্ঘ চতুর্দশ বর্ষের জন্য বনবাস গ্রহণ করিলে পর এই সুদীর্ঘ বিরহের ভিতরে অযোধ্যা নগরীতে আর কোন আনন্দোৎসব হয় নাই; ভরত সন্ন্যাসী, শত্রুঘ্ন সন্ন্যাসী, সমগ্র অযোধ্যা নগরীও যেন রামচন্দ্রের প্রতীক্ষায় 'ধৃতৈকবেণী' তপস্বিনী! আজ যেন রামচন্দ্র ফিরিয়া আসিয়া আপন হস্তে সেই শ্বেত-সৌধ-বসনা 'ধৃতৈকবেণী' অয্যোধার অগুরু সুরভিত কাল কেশদাম মুক্ত করিয়া দিয়াছেন!

সীতার বনবাসী শিশু পুত্রদ্বয় কুশ এবং লব মহর্ষি বাল্মীকির সহিত রাজ সভায় আসিয়া বীণাযোগে রামায়ণ গান আরম্ভ করিল। কোমলকণ্ঠ শিশুদ্বয়ের সঙ্গীতের করুণ মাধুর্যে সমগ্র রাজসভা সজল নয়নে স্তব্ধ হইয়া গেল। কবি বলিলেন,

তদ্‌গীতশ্রবণৈকাগ্রা সংসদশ্রুমুখী বভৌ।
হিমনিস্যন্দিনী প্রাতর্নির্বাতেব বনস্থলী॥ (১৫।৬৬)

সুমধুর বালকণ্ঠে গীত সেই করুণমধুর সঙ্গীত শুনিয়া সমাহিত নিষ্পন্দ বিরাট সভা অশ্রুমুখী হইল, সে যেন শিশিরস্নিগ্ধ নির্বাত প্রভাতের নিস্তব্ধ বনস্থলী। সংসদের সেই অশ্রু যেন সঙ্গীত শ্রবণে যুগপৎ অসীম মাধুর্য এবং করুণায় বিগলিত চিত্তেরই নিস্তব্ধ ভাষা,—এমনিতর একটা অব্যক্ত করুণা এবং মাধুর্যেরই ভাষা প্রভাত-বনস্থলীর গায়ে স্বচ্ছশীতল শিশির বিন্দু। সমাহিত নিষ্পন্দ সংসদ যেন প্রভাতের নির্বাত বনস্থলী।

কালিদাসের প্রায় প্রত্যেকগুলি উপমারই বিশেষত্ব এই যে উপমাগুলির ভিতরে একটা আশ্চর্য স্থিতিস্থাপকতা গুণ রহিয়াছে। তাহাকে ডাইনে বাঁয়ে ঊর্ধ্বে অধে যতখানি টানা যায়, সে তত-খানিই বাড়ে, সহসা ছিঁড়িয়া যায় না,—আবার ছাড়িয়া দিলেই আসিয়া সঙ্কুচিত হয় একটি চিত্রের ভিতরে। উপমাগুলির ভিতরে যেমন একটা আপাতমাধুর্য, অর্থের চমৎকারিত্ব রহিয়াছে, তেমনিই ইহাদের ভিতরে গর্ভিত হইয়া থাকে অনেকখানি সম্ভাবনা। সেই গর্ভিত সম্ভাবনার অস্ফুট আভাস স্পষ্ট অর্থকে আরও গভীরতা আরও রহস্য দান করে। "কিঞ্চিৎপরিলুপ্তধৈর্যঃ' মহাদেবকে কালিদাস যেখানে 'চন্দ্রোদয়ারম্ভ ইবাম্বুরাশিঃ'-র সঙ্গে তুলনা করিলেন, তখন স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে মহাদেবের যোগসমাহিত চিত্তে সমুদ্রবক্ষের ঈষৎ চাঞ্চল্য ; কিন্তু এই সমুদ্রের সহিত মহাদেবের তুলনার ভিতরে গর্ভিত হইয়া আছে আরও অনেকখানি কথা। মহাদেবের চিত্ত এমনই বিরাট যে, সমুদ্রবক্ষের মত সে যেমন ঈষৎ উদ্বেলও হইতে পারে, আবার সমুদ্রের মতনই ভীষণ রুদ্রমূর্তিও ধারণ করিতে পারে ; মহাদেবের বিক্ষুব্ধ চিত্তের সেই সমুদ্রসম প্রচণ্ডাঘাতেও মুহূর্তে সমগ্র বিশ্বসৃষ্টি ত্রস্ত হইয়া উঠিতে পারে। এই গর্ভিত সম্ভাবনাকে পশ্চাতে রাখিয়াই মহাদেবের চিত্তের ঈষৎ উদ্বেল এখানে এতখানি সার্থক হইয়া উঠিয়াছে। কালিদাস যেখানে আসন্নপ্রসবা সুদক্ষিণাকে 'প্রভাত-কল্পা শশিনেব শর্বরী' বলিলেন, সেখানে যে তিনি প্রভাতকল্পা শর্বরীর

কালিদাসের উপমায় স্থিতিস্থাপকতা গুণ

পাণ্ডুতার সহিত গর্ভিণী সুদক্ষিণার পাণ্ডুতারই তুলনা করিয়াছেন তাহা নহে,—সেই প্রভাতকল্পা শর্বরীর ভিতরে বিশ্ব-উজ্জ্বলকারী প্রভাত-সূর্যের আসন্ন উদয় যেমন গর্ভিত রহিয়া প্রভাতকল্পা শর্বরীর সেই পাণ্ডুতাকেই একটা বিরাট মহিমা দান করে, সুদক্ষিণার পাণ্ডুতার ভিতরেও রহিয়াছে সেই আসন্ন-মাতৃত্বের মহিমা। শকুন্তলাকে যেখানে অনাঘ্রত ফুল, অবিচ্ছন্ন কিশলয়, অনাবিদ্ধ রত্ন, অনাস্বাদিতরস মধু বলা হইয়াছে, সেখানে শকুন্তলার অস্পৃষ্ট অভুক্ত কুমারীত্বই যে সুন্দরভাবে প্রকাশ পাইয়াছে তাহা নহে, তাহার পশ্চাতে জাগিয়া উঠিয়াছে কুমারী শকুন্তলার অনবদ্য ভোগযোগ্যত্ব,—সে তখনও বিশ্বের কামনার বস্তু। কালিদাসের প্রায় প্রত্যেক উপমার ভিতরেই রহিয়াছে এই জাতীয় একটা স্থিতি-স্থাপকতা গুণ। অতি ছোট ছোট উপমাগুলির ভিতরেও এই যে একটা প্রচ্ছন্ন মহিমা, এই যে কিছু-বলার ভিতরে আবার কিছু-না-বলা কথা তাহা পাঠক-চিত্তকে সহজেই আকৃষ্ট করে।

কালিদাসের উপমার এই স্থিতিস্থাপকতা গুণের আলোচনা প্রসঙ্গেই লক্ষণীয় কালিদাসের উপমার 'ঔচিত্য'। দেশকাল পাত্রের সমস্ত অবস্থানের সহিত এমন নিপুণভাবে উপমাটিকে মিলাইয়া দিয়া শ্লোকের আনাচে কানাচে এমন অর্থ ভরিয়া দিতে কালিদাস অদ্বিতীয়। আমরা কালিদাসের যে-সকল শ্লোক লইয়া উপরে আলোচনা

কালিদাসের উপমার 'ঔচিত্য' বিচার

করিয়াছি, তাহার প্রায় প্রত্যেকটির ভিতরেই দেখিতে পাইব এই দেশ-কাল-পাত্রের নিপুণ সমাবেশ।

সংস্কৃত আলঙ্কারিকগণের ভিতরে একদল 'ঔচিত্যবাদী' আছেন। তাঁহারা বলেন যে বাক্যের 'ঔচিত্য' অর্থাৎ দেশ-কাল-পাত্র প্রভৃতি সকল দিক দিয়া বিচার করিয়া বাক্যের যে সুষ্ঠুতম প্রয়োগ তাহাই কাব্যের কাব্যত্ব। বাক্যের এই 'ঔচিত্যের' ভিতর দিয়াই সে গ্রহণ করে একটা অনন্যসাধারণ রমণীয়তা,—তাহাই কাব্যের প্রাণবস্তু। এই মতটি সম্পূর্ণ গ্রহণীয় না হইলেও ইহার ভিতরে বেশ ভাবিবার কথা আছে। সমস্ত দিক দিয়া বিচার করিলে যাহা উচিত বোধ হয়, মনের সেই ঔচিত্য-বোধ এবং সঙ্গতি বা সুষমা-বোধের সঙ্গে সৌন্দর্য-বোধের একটা নিগূঢ় সংযোগ রহিয়াছে; কারণ সৌন্দর্য-বোধের মূলেও রহিয়াছে সঙ্গতি বা সুষমা। এই ঔচিত্য মতে বিচার করিলে কালিদাসের উপমাগুলি যে তাঁহার কাব্যে কত প্রধান হইয়া উঠিয়াছে তাহা স্পষ্টই বোঝা যায়।

শকুন্তলা নাটকে দেখিতে পাই, মহর্ষি কণ্ব আশ্রমে ফিরিয়া আসিয়া আকাশবাণীতে দুষ্যন্তের সহিত শকুন্তলার সকল প্রণয়-কাহিনী জানিতে পারিলেন। প্রিয়ংবদার মুখে জানিতে পাই, মহর্ষি কণ্ব শকুন্তলাকে কোলের কাছে ডাকিয়া বলিয়াছিলেন,—'ধূমাউলিদদিট্ঠিণো বি জজমাণস্স পাবএ আহুই পড়িদা'—অর্থাৎ যজ্ঞীয় ধূমের দ্বারা আকুলিতদৃষ্টি যাজ্ঞিকের ঘৃতাহুতিও অগ্নিতেই পড়িয়াছে। আশ্রমপালিতা আশ্রমকন্যা হইলেও

শকুন্তলা তাহার যোগ্য স্বামীই লাভ করিয়াছে। এখানে আর কালিদাস নবমালিকা এবং সহকারের মিলনের দৃশ্যটি আনিলেন না,—আশ্রমপালিতা শকুন্তলা এখানে ধূমাকুলিতদৃষ্টি যাজ্ঞিকের হস্তের ঘৃতাহুতি,—রাজা দুষ্যন্ত এখানে যজ্ঞীয় অগ্নি। এই-খানেই কলিদাসের নিপুণ মাত্রা জ্ঞান,—এইখানেই তাঁহার দেশ-কাল-পাত্রের অটুট বিচার। এখানে বক্তা মহর্ষি কণ্ব,—স্থান তাঁহার তপোবন,—সুতরাং সেখানে শকুন্তলা এবং দুষ্যন্ত যজ্ঞের হবি এবং অগ্নি ভিন্ন আর কি হইতে পারে? এই দেশ-কাল-পাত্রের সহিত নিবিড় সঙ্গতি দ্বারাই বক্তব্যটি এত মধুর হইয়া ওঠে।

'দেবতাত্মা' নগাধিরাজ হিমালয়ের উমা সম্বন্ধেও সেই কথা দেখিতে পাই,—

> ঋতে কৃশানোর্নহি মন্ত্রপূত-
> মর্হন্তি তেজাংস্যপরাণি হব্যম॥ (১।৫১)

'মন্ত্রপূত হবি কখনও অগ্নি ব্যতীত অন্য কোন তেজোবস্তুতে নিক্ষিপ্ত হইতে পারে না।' উমাও সেইরূপ মহাদেব ব্যতীত আর কাহারও নিকটে অর্পিতা হইতে পারে না।

মহর্ষি কণ্ব আবার যেখানে পিতা সেখানে তাঁহার উক্তির ভিতর দিয়া আবার পিতৃত্ব ক্ষরিয়া পড়িতেছে। শকুন্তলাকে আর্যা গৌতমী এবং ঋষিগণের সহিত পতিগৃহে পাঠাইয়া দিয়া ব্যথিত কণ্ব কহিলেন,—স্নেহপ্রবৃত্তি ঠিক এই রকমই; তবু যাক, আজ শকুন্তলাকে পাঠাইয়া দিয়া আমি যেন এখন পুনরায়

স্বাস্থ্য ফিরিয়া পাইলাম ; কারণ, কুমারী কন্যা যেন পিতার নিকটে পরের ন্যস্ত ধন,—যতক্ষণ পর্যন্ত আবার প্রত্যর্পণ করা না যায়,—ততক্ষণই যেন আর সোয়াস্তি নাই ; সেই পর-ন্যস্ত ধন শকুন্তলাকে আজ পতিগৃহে পাঠাইয়া দিয়া আমিও নিশ্চিন্ত এবং নিরুদ্বেগ হইলাম।

অর্থো হি কন্যা পরকীয় এব
তামদ্য সংপ্রেষ্য পরিগ্রহীতুঃ।
জাতো মমায়ং বিশদঃ প্রকামং
প্রত্যর্পিত-ন্যাস ইবান্তরাত্মা॥

গৌতমী এবং শার্ঙ্গরব প্রভৃতি ঋষি সমভিব্যাহারে শকুন্তলা যেদিন দুষ্যন্তের রাজসভায় উপস্থিত হইল তখন শার্ঙ্গরব রাজা দুষ্যন্তকে বলিয়াছিলেন,—

ত্বমর্হতাং প্রাগ্রহরঃ স্মৃতোঽসিনঃ
শকুন্তলা মূর্তিমতী চ সৎক্রিয়া।

'তুমি যেমন শ্রদ্ধার্হ লোকগণের অগ্রগণ্য, আমাদের শকুন্তলাও ঠিক তেমনই মূর্তিমতী সৎক্রিয়া।' শার্ঙ্গরব একথা বলিলেন না,—হে রাজন্, তুমি যেমন সুচতুর মধুকর, আমাদের শকুন্তলাও তেমনই মধুভরা অনাঘ্রাত পুষ্প। যৌবনোন্মত্ত রাজা দুষ্যন্তের নিকটে যে শকুন্তলা একদিন ছিল অনাঘ্রাত পুষ্প, নখদ্বারা অচ্ছিন্ন কিশলয়, অনাবিদ্ধ রত্ন, অনাস্বাদিতরস মধু, শার্ঙ্গরবের বর্ণনায় সেই শকুন্তলাই 'মূর্তিমতী সৎক্রিয়া।' নারীর পার্থিব রূপ আঁকিতে কালিদাস মর্ত্যের মাটিত কতই ঘাটিয়াছেন,—

কিন্তু মহর্ষি বাল্মীকির সহিত সীতা যেদিন শিশু-পুত্রদ্বয় সহ রামের সম্মুখে দাঁড়াইয়াছে সেদিন সীতা নবোদিত সূর্যের সম্মুখে ঋষি-কণ্ঠের গায়ত্রী !

রাজা রঘু যেদিন বিশ্বজিৎ যজ্ঞে সর্বস্ব দান করিয়া শুধু দেহমাত্রে অবস্থান করিতেছিলেন, সেদিন বনের ঋষিগণ বলিয়াছিলেন,—

শরীরমাত্রেণ নরেন্দ্র তিষ্ঠন্
আভাতি তীর্থপ্রতিপাদিতর্ধিঃ।
আরণ্যকোপাত্ত-ফল-প্রসূতিঃ
স্তম্বেন নীবার ইবাবশিষ্টঃ॥ (৫।১৫)

'মহারাজ, সমস্ত ধনরাশি উপযুক্ত পাত্রে অর্পণ করিয়া আপনি শুধু দেহাবশিষ্ট হইয়া অবস্থান করিতেছেন ; আরণ্যক ঋষিগণ সমস্ত শস্য তুলিয়া লইয়া গেলে নীবার যেমন স্তম্বমাত্রে অবশিষ্ট থাকে, আপনিও আজ সেইরূপ।' ধন-সম্পদ বিলাইয়া দিয়া রাজা রঘু আজ মুনিদের নিকটে শস্যহীন স্তম্বে অবশিষ্ট নীবার। বনের ঋষিগণ আর কোথায় উপমা পাইবেন ? সম্পদহীন রাজার প্রতিমূর্তি তাঁহারা দেখিয়াছেন শস্যহীন স্তম্বাবিশিষ্ট নীবারে।

কালিদাসের কাব্যে উপমা রহিয়াছে প্রায় প্রত্যেক ছত্রে ছত্রে। সেই সকল উপমার ভিতরে কতকগুলি হয়ত অন্য কবির পক্ষেও সম্ভব হইত ; কিন্তু কালিদাসের উপমার ভিতরে এমন অনেকগুলি উপমা রহিয়াছে, যাহা কালিদাসের নামে

একেবারে শীলমোহর করা। শুধু স্থিতিস্থাপকতা-গুণে নহে,—কালিদাসের উপমার বৈশিষ্ট্য তাঁহার অনুভূতির সূক্ষ্মতায়, গভীরতায় এবং বিরাটত্বে, তাঁহার কল্পনার সূক্ষ্মতায়, বিপুলতায় এবং বৈচিত্র্যে। একদিকে দেখিতে পাই, সমগ্র বিশ্বসৃষ্টি তাহার সকল চন্দ্রসূর্য, গ্রহনক্ষত্র, গিরিনদী, তরুলতা, ফলপুষ্প, পশু-পক্ষী লইয়া, এবং মানুষ, তাহার রূপের সকল সূক্ষ্ম সৌষম্য, তাহার জীবনের সকল সুখদুঃখ, ভালমন্দ, হাসিকান্না, বিরহ-বিচ্ছেদ—সকল বৈচিত্র্য লইয়া কবির মনের ভিতরে নিবিড় ভাবে যেন একান্ত বাস্তবরূপে বাসা বাঁধিয়া আছে ; অন্যদিকে আবার দেখিতে পাই কল্পনা-শক্তির সাবল্যে মুহূর্তে পাঠকের নিকটে সেই মনের জগৎকে একান্ত প্রত্যক্ষ করিয়া তুলিবারও অসীম শক্তি রহিয়াছে কবির ভিতরে। এই আদান-প্রদানের নিজস্বতার ভিতর দিয়াই ফুটিয়া উঠিয়াছে কবি-প্রতিভার স্বাতন্ত্র্য। কবির দর্শনশক্তি এবং শ্রবণশক্তির ভিতরে একটা বিশিষ্ট স্বাধীন ভঙ্গি ছিল, সেই স্বাধীন চিন্তাধারাকে কবি স্বাধীন কল্পনার পক্ষে নিঃসীম শূন্যে মুক্তি দিয়াছেন,—স্বচ্ছন্দ তাহার গতি,—বিপুল তাহার পরিধি।

কালিদাসের উপমার বৈচিত্র্য ও বিরাটত্ব

কবিকে স্বভাবতই তাঁহার বক্তব্য অনেকখানি বাড়াইয়া বলিতে হয় ; কারণ যে অনুভূতি কবির কাছে প্রত্যক্ষ,—পাঠকের নিকট তাহা পরোক্ষ ; তাই পাঠকের নিকটে অনেকখানি বাড়াইয়া তুলিতে না পারিলে পাঠক রসের

সমগ্রতাকে লাভ করিতে পারে না। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন,—"আমার সুখদুঃখ আমার কাছে অব্যবহিত, তোমার কাছে তাহা অব্যবহিত নয়। আমি হইতে তুমি দূরে আছ। সেই দূরত্বটুকু হিসাব করিয়া আমার কথা তোমার কাছে কিছু বড় করিয়াই বলিতে হয়।

সত্যরক্ষণ-পূর্বক এই বড় করিয়া তুলিবার ক্ষমতায় সাহিত্য-কারের যথার্থ পরিচয় পাওয়া যায়। যেমনটি ঠিক তেমনটি লিপিবদ্ধ করা সাহিত্য নহে; কারণ, প্রকৃতিতে যাহা দেখি, তাহা আমার কাছে প্রত্যক্ষ, আমার ইন্দ্রিয় তাহার সাক্ষ্য দেয়। সাহিত্যে যাহা দেখায়, তাহা প্রাকৃতিক হইলেও তাহা প্রত্যক্ষ নহে। সুতরাং সাহিত্যে সেই প্রত্যক্ষতার অভাব পূরণ করিতে হয়।"

সাহিত্যে যে আমাদের মনের সূক্ষ্ম রসানুভূতিগুলিকেই অপরের নিকটে বাড়াইয়া বলিতে হয় তাহা নহে,—প্রাকৃতিক স্থূল বস্তুকেও অনেকখানি বাড়াইয়া বলিয়া অপরের নিকটে তাহার স্বরূপের পরিচয় দিতে হয়।

নিজের মনের ভাবকে বাহিরে কতখানি বাড়াইয়া বলিলে পাঠক কবি-মানসের সন্ধান পাইতে পারে, কবি-অনুভূতির সকল সূক্ষ্ম সৌকুমার্য এবং বৈচিত্র্য, তাহার গাম্ভীর্য এবং বিরাটত্ব অপরের নিকটে ধরা পড়িতে পারে এ জিনিসটি কালিদাসের অতি নিপুণভাবে জানা ছিল। আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি, যোগভগ্ন মহাদেবের ঈষৎ চিত্তচাঞ্চল্যকে কবি

কেমন করিয়া ভাষা দিয়াছেন, রঘুরাজের প্রসবিত্রী রাণী সুদক্ষিণার মূর্তিকে কবি কেমন করিয়া প্রভাতকল্পা শর্বরীর রূপ দিয়াছেন। এই গর্ভিণী সুদক্ষিণা সম্বন্ধেই বলা হইয়াছে,—

নিধানগর্ভামিব সাগরাম্বরাং
শমীমিবাভ্যন্তর-লীন-পাবকাম্।
নদীমিবান্তঃসলিলাং সরস্বতীং
নৃপঃ স-সত্ত্বাং মহিষীমমন্যত ॥ (৩।৯)

অন্তঃসত্ত্বা মহিষীকে রাজা দিলীপ সাগরাম্বরা রত্নগর্ভা বসুন্ধরার ন্যায়, অগ্নিগর্ভা শমীর ন্যায় এবং অন্তঃসলিলা সরস্বতী নদীর ন্যায় মনে করিতেন।

রোরুদ্যমানা শকুন্তলা যখন আশ্রম ছাড়িয়া পতিগৃহে যাত্রা করিতেছে, তখন মহর্ষি কণ্বও বলিয়াছিলেন,—

তনয়মচিরাৎ প্রাচীবার্কং প্রসূয় চ পাবনং
মম বিহরজং ন ত্বং বৎসে শুচং গণয়িষ্যসি ॥

'হে বৎসে, পূর্বদিক্ যেমন সূর্যকে প্রসব করে, তেমনই অচিরে একটি পুত্র প্রসব করিয়া তুমি আমার বিরহ-জনিত শোক আর গণনা করিবে না।' শকুন্তলা শীঘ্রই এমন পুত্র প্রসব করিবে যাহার নামে এই বিশাল সাম্রাজ্য ভারতবর্ষ বিখ্যাত হইয়া থাকিবে,—এমন পুত্রকে প্রসব যেন 'প্রাচীবার্কং প্রসূয়!' শকুন্তলা নাটকের চতুর্থ অঙ্কেও দেখিতে পাই,—শকুন্তলা সম্বন্ধে মহর্ষি কণ্বের নিকটে আকাশবাণী হইয়াছে,—

অবেহি তনয়াং ব্রহ্মন্নগ্নিগর্ভাং শমীমিব ॥

'হে ব্রাহ্মণ তুমি তোমার এই তনয়াকে অগ্নিগর্ভা শমীর ন্যায় জানিও।' গর্ভবতী শকুন্তলা আজ 'অগ্নিগর্ভা শমী!'

'মেঘদূতে'র ভিতরে দেখিতে পাই, যক্ষ মেঘের নিকটে কৈলাস পর্বতের পরিচয় দিতেছে,—

গত্বা চোর্ধ্বং দশমুখভুজোচ্ছ্বাসিতপ্রস্থসন্ধেঃ
কৈলাসস্য ত্রিদশবনিতাদর্পণস্যাতিথিঃ স্যাঃ।
শৃঙ্গোচ্ছ্রায়ৈঃ কুমুদবিশদৈ র্যো বিতত্য স্থিতঃ খং
রাশীভূতঃ প্রতিদিনমিব ত্র্যম্বকস্যাট্টহাসঃ ॥ (পূ।৫৮)

'হে মেঘ, ঊর্ধ্বদিকে গমন করিয়া, রাবণের ভুজ দ্বারা বিভক্তসন্ধি এবং দেববনিতাগণের দর্পণ স্বরূপ কৈলাস পর্বতের অতিথি হইবে; যে কৈলাস কুমুদের ন্যায় শুভ্রবর্ণ উচ্চ শৃঙ্গসমূহের দ্বারা আকাশ ব্যাপ্ত করিয়া প্রত্যহ মহাদেবের পুঞ্জীভূত অট্টহাসের ন্যায় বিরাজ করিতেছে।' শুভ্রতুষার কিরীটিনী শুভ্র সৌরকরে প্রদীপ্ত অভ্রভেদী কৈলাসের শৃঙ্গগুলি যেন মহাকালের অধীশ্বর দেবাদিদেব ত্র্যম্বকের প্রতিদিনের পুঞ্জীভূত অট্টহাসি!

'ঋতু-সংহার' কাব্যে শরৎ-বর্ণনা প্রসঙ্গে কবি বলিতেছেন,—

ব্যোম ক্বচিদ্রজত-শঙ্খ-মৃণাল-গৌরৈ—
স্ত্যক্তাম্বুভির্লঘুতয়া শতশঃ প্রয়াতৈঃ।
সংলক্ষ্যতে পবন-বেগ-চলৈঃ পয়োদৈ
রাজেব চামর-বরৈরুপবীজ্যমানঃ ॥ (৪)

শরতের বারিহীন রজত-শঙ্খ-মৃণালের ন্যায় শুভ্র লঘু মেঘ-গুলি পবনবেগে যেন শত সহস্র খণ্ডে বিভক্ত হইয়া ইতস্তত চালিত হইতেছে,—দেখিয়া মনে হয়, ব্যোমরূপী মহারাজ যেন শুভ্র মেঘের অসংখ্য চামরের দ্বারা উপবীজিত হইতেছেন!

কালিদাসের এই জাতীয় উপমার ভিতরে বর্ণিত বিষয়ই যে তাহার সকল বিরাটত্ব এবং মহত্ত্ব লইয়া পরিস্ফুট হইয়া ওঠে তাহা নহে,—ইহা পাঠকের মনকেও দেয় একটা বিরাট মুক্তি,—তাহার চিরপরিচিত পারিপার্শ্বিকতার সীমাবদ্ধতা হইতে,—এমন কি কাব্যের বিষয় বস্তু হইতেও। কাব্যের দিক্ হইতে বিচার করিলে বলা যায়,—এই জাতীয় উপমাগুলি যেন তাঁহার কাব্যের বাতায়ন-স্বরূপ। ইহার ভিতর দিয়া বর্ণিত বিষয় বা ঘটনার ভিতরে এক ফাঁকে যেন বাহিরের সীমাহীন আকাশ—সাগর-পর্বত আলো-বাতাস আসিয়া উঁকি মারিয়া যায়,—মন মুহূর্তের জন্য পায় মুক্তি,—সে ওঠে নবীন সরসতায় ভরিয়া। অথচ কল্পনার এই মুক্তির সহিত কাব্যের মূল প্রসঙ্গের যে কোনও যোগ নাই তাহা নহে, উপমেয়ের সহিত নিগূঢ় যোগ-সূত্রে এই উপমান গুলিরও কাব্যের মূল সুরের সহিত রহিয়াছে একটি অখণ্ড যোগ; সেই অখণ্ড যোগের ভিতরেই তাহারা আবার আনে চিত্তের ক্ষণিক মুক্তি,—এইখানেই তাহাদের বিশেষত্ব।

'বিক্রমোর্বশী' নাটকে দেখিতে পাই,—

উদয়-গূঢ়-শশাঙ্ক-মরীচিভি-
স্তমসি দূরমিতঃ প্রতিসারিতে।

অলক-সংযনাদিব লোচনে
হরতি মে হরিবাহনদিঙ্মুখম্ ॥

চন্দ্র এখনও উদিত হয় নাই,—এখনও 'উদয়-গূঢ়' ; সেই উদয়-গূঢ় চন্দ্রের উদ্ভাসে অন্ধকাররাশি দূরে প্রতিসারিত হইলে মনে হইল, যেন মুখের উপর হইতে অলকভার সংযমন করিলে পর দিগ্‌বধূর মুখখানি চোখের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিল। চন্দ্রের উদয়গূঢ় উদ্ভাসই যেন দিগ্বধূর সৌম্যোজ্জ্বল মুখকান্তি,—অন্ধকাররাশি যেন তাহার অলকভার। 'বিক্রমোর্বশী' নাটকেই অন্যত্র রাজা বলিতেছেন,

'বিদ্যুল্লেখা-কনক-রুচির-শ্রীর্বিতানং মমা-ভ্রো'—বিদ্যুৎলেখার কনকসূত্রে যেন মাথার উপরে ঘন মেঘের চন্দ্রাতপ টাঙান হইয়াছে !

'রঘুবংশে'র ভিতরে দেখিতে পাই,—রাজা দিলীপ পুত্র-লাভের মানসে রাণী সুদক্ষিণাকে সঙ্গে করিয়া বশিষ্ঠের তপোবন অভিমুখে রথে যাত্রা করিলেন। ঊর্ধ্বে নীল আকাশের গায়ে শুভ্র বলাকাশ্রেণী ঈষৎ উন্নমিত এবং অবনমিত হইয়া চলিতেছে,

শ্রেণীবন্ধাদ্-বিতন্বদ্ভি-রস্তম্ভাং তোরণ-স্রজম্।
সারসৈঃ কলনির্হ্রাদৈঃ ক্বচিদুন্নমিতাননৌ ॥ (১।৪১)

কল-নিনাদে আকাশ ভরিয়া দিয়া সেই শুভ্র সারস-মালা যেন অস্তম্ভ তোরণ-মালার ন্যায় বাতাসে উড়িতেছিল,—রাজা ও রাণী উভয়েই মুখ বাহির করিয়া তাহা দেখিতেছিলেন। তারপরে আবার দ্বিতীয় সর্গে দেখিতে পাই,—সন্ধ্যাসমাগমে বশিষ্ঠঋষির

হোমধেনু নন্দিনী বনান্তর হইতে পুনরায় আশ্রমে ফিরিয়া আসিয়াছে, সেই পল্লব-স্নিগ্ধা পাটলবর্ণা নন্দিনীর ললাটে ঈষৎ কুঞ্চিত শ্বেতরোমরাজির অঙ্কন যেন পাটলবর্ণা সন্ধ্যার আকাশ-ভালে নবোদিত চন্দ্রের টিপ।

ললাটোদয়মাভুগ্নং পল্লব-স্নিগ্ধ-পাটলা।
বিভ্রতী শ্বেতরোমাঙ্কং সন্ধ্যেব শশিনং নবম্॥ (১।৮৩)

মহারাজ দিলীপ পুত্রলাভের জন্য এই আশ্রমধেনু নন্দিনীর পরিচর্যাব্রত গ্রহণ করিলেন। সেই হোমধেনু নন্দিনীকে অগ্রে রাখিয়া রক্ষকরূপে দিলীপ যখন তাহার পশ্চাৎ-অনুসরণ করিতেছিলেন, কবি তখনও রাজার রাজৈশ্বর্য বা মহত্ত্বকে ক্ষুণ্ণ হইতে দিলেন না। রাজা যেন গো-রূপা সসাগরা পৃথিবীরই রক্ষক হইয়া বনে বিচরণ করিতেছিলেন।

পয়োধরীভূত-চতুঃসমুদ্রাং
জুগোপ গোরূপধরামিবোর্বীম্॥ (২।৩)

চারিটি সমুদ্র আজ যেন নন্দিনীর পয়োধরের চারিটি বাঁট হইয়া শোভা পাইতেছে,—সেই পয়োধরীভূত-চতুঃসমুদ্রা গোরূপধরা পৃথিবীকেই যেন দিলীপ এই পার্বত্য অরণ্যে পালন করিতেছিলেন

'রঘুবংশে'র দ্বিতীয় সর্গেই দেখিতে পাই, সন্ধ্যায় নন্দিনী বশিষ্ঠের আশ্রমে ফিরিতেছে। দিগ্‌দিগন্ত সঞ্চারপূত করিয়া দিনের অবশেষে পল্লবরাগতাম্রা সূর্যের প্রভা এবং মুনির ধেনু উভয়ই আপন আপন নিলয়ে ফিরিয়া চলিল,—পল্লবরাগতাম্রা

সূর্যপ্রভা পশ্চিম নিলয়ে দিনের পরে ফিরিয়া আসিল, আর পল্লবরাগতাম্রা হোমধেনুটি ফিরিয়া আসিল মুনির আশ্রমে।

সঞ্চারপূতানি দিগন্তরাণি
কৃত্বা দিনান্তে নিলয়ায় গন্তুম্।
প্রচক্রমে পল্লবরাগতাম্রা
প্রভা পতঙ্গস্য মুনেশ্চ ধেনুঃ ॥ (২।১৫)

সারাদিন বনে নন্দিনীকে চরাইয়া রাজা দিলীপ সন্ধ্যায় আশ্রমে ফিরিয়াছেন। রাণী সুদক্ষিণা ব্যাকুল আগ্রহে অগ্রবর্তিনী হইয়া তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করিয়া ধেনুর আগে আগে চলিল,—পশ্চাতে মহারাজ দিলীপ,—মাঝখানে গাভী নন্দিনী। তখন সেই পাটলবর্ণা গাভী নন্দিনীকে মনে হইতেছিল, যেন দিন এবং রজনীর মধ্যবর্তিনী পাটলবর্ণা মূর্তিমতী সন্ধ্যা!

পুরস্কৃতা বর্ত্মনি পার্থিবেন
প্রত্যুদ্গতা পার্থিব-ধর্মপত্ন্যা।
তদন্তরে সা বিররাজ ধেনু-
র্দিনক্ষপামধ্যগতেব সন্ধ্যা ॥ (২।২০)

অজ এবং ইন্দুমতীর বিবাহে তাহারা উভয়ে যখন যজ্ঞীয় হোমাগ্নি প্রদক্ষিণ করিতেছে তখন,—

প্রদক্ষিণপ্রক্রমণাৎ কৃশানো-
রুদর্চিষস্তন্মিথুনং চকাশে।
মেরোরুপান্তেষ্বিব বর্তমান-
মন্যোন্য-সংসক্তমহস্ত্রিযামম্ ॥ (৭।২৪)

প্রজ্বলিত অগ্নি প্রদক্ষিণের গতিতে সেই দম্পতি যেন মেরুর উপান্তে অন্যোন্য-সংসক্ত দিনযামিনীর ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। দিন এবং রজনী যেন অঞ্চলে গ্রন্থি বাঁধিয়া প্রদক্ষিণ করিতেছে,—মাঝখানে দাঁড়াইয়া যজ্ঞাগ্নিরূপ সুমেরু। সুমেরুকে যজ্ঞাগ্নি বলিবারও যথেষ্ট সার্থকতা রহিয়াছে। দিবা এবং রাত্রির মিলন হয় প্রভাতে এবং সন্ধ্যায়। উভয় সময়ই সূর্যের আরক্তিম কিরণ প্রতিফলিত হয় পর্বতগাত্রে, পর্বত-শিখর তখন যেন একটা অভ্রভেদী জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ড। সেই অগ্নিকুণ্ডই যেন দিনরজনীর মিলনক্ষণের সাক্ষীভূত হোমাগ্নি। ঠিক এই শ্লোকটিই আবার দেখিতে পাই 'কুমার-সম্ভবে' হরপার্বতীর যজ্ঞাগ্নি প্রদক্ষিণ কালে।

'শৃঙ্গার-তিলকে'র* ভিতর দেখিতে পাই, একটি নারী সখীগণকে বলিতেছে,—বহুদিন প্রবাসের পর প্রিয়তম ফিরিয়া আসিয়াছে,—প্রবাসের কাহিনী শুনিতে শুনিতেই কথায় কথায় অধরাত্রি কাটিয়া যায়; তারপরে আমি যখন লীলা-কলহ-কোপের সূত্রপাত করি, ইহার মধ্যেই পূর্বদিক সতীনের মত লাল হইয়া ওঠে!

সপত্নীব প্রাচী দিগিয়মভবত্তাবদরুণা॥

* 'শৃঙ্গার-তিলক' প্রভৃতি কাব্যভাগগুলি কালিদাসের রচিত নয় বলিয়াই পণ্ডিতগণের সিদ্ধান্ত; এই উৎপ্রেক্ষাটি কালিদাসের উৎপ্রেক্ষার সমজাতীয় বলিয়া এখানে ইহার আলোচনা করা গেল।

প্রিয়মিলন-সুখ হইতে রক্তারুণ প্রভাত যে কিরূপে নারীকে বঞ্চিত করে তাহা ঐ একটিমাত্র উৎপ্রেক্ষায় স্পষ্টতমরূপে প্রকাশ পাইয়াছে, প্রাচী সপত্নীর মত লাল হইয়া যায়!

উপমা প্রভৃতি অর্থালঙ্কারের ভিতরে একটি প্রধান জিনিস অচেতন জড় প্রকৃতিকে চেতনের অনুরূপ করিয়া ভাবা। ইহাকে আমরা বলিতে পারি জীববদ্-ব্যবহার বা personification। সংস্কৃতের 'সমাসোক্তি' অলঙ্কারের পশ্চাতে রহিয়াছে জড়-প্রকৃতিকে এইরূপ জীববদ্-ব্যবহার। সাহিত্য প্রধানত মানুষের জীবনকে অবলম্বন করিয়া, বহির্জগতের ভিতরে এই জীবনের সাধর্ম্য খুঁজিয়া পাইতে হইলে বহিঃপ্রকৃতির প্রবাহকে আমাদের জীবনের এই প্রবাহ হইতে অভিন্ন করিয়া দেখিতে হয়। জীববদ্-ব্যবহারের পশ্চাতেও রহিয়াছে এই জীবনধারা ও সৃষ্টিপ্রবাহ-ধারার ভিতরে একটা প্রচ্ছন্ন ঐক্যবোধ। মানুষের চেতনধর্মের ভিতরে এইভাবে বহিঃপ্রকৃতিকে মানুষের মতন করিয়া দেখিবার একটা প্রচ্ছন্ন বাসনা চিরকালই রহিয়াছে। এই বাসনাকে আমরা নাম দিতে পারি মানুষী-করণ বা Anthropomorphism। বহিঃপ্রকৃতিকে এইভাবে মানুষের দৈহিকরূপ ও তাহার অন্তর পুরুষের সমান করিয়া দেখিবার ভিতরে আছে বহিঃপ্রকৃতির ভিতর দিয়া একটা গভীর আত্মোপলব্ধির আনন্দ,—সেই আনন্দকেই আমরা রূপান্তরিত ভাবে দেখিতে পাই কাব্যের এই জীববদ্-ব্যবহারের ভিতরে।

জীববদ্-ব্যবহার
এবং
কালিদাসের উপমা

মূক, বধির অচেতন প্রকৃতিকে আমরা আমাদের চেতনার ভিতরে নিরন্তর জ্ঞাতে অজ্ঞাতে যে প্রাণধর্মে উজ্জীবিত করিয়া তুলিতেছি, তাহাকে অতি স্পষ্ট করিয়া পাই কাব্যের এই অর্থালঙ্কারের ভিতরে। এখানে কাব্যে যে আমরা শুধু ভাবসম্বেগের সম্যক্ প্রকাশ দেখিয়াই আনন্দিত হই তাহা নহে, ইহার ভিতরে আমাদের থাকে আরও একটা পাওনা,—সে এই জীববদ্-ব্যবহারের আনন্দ,—বিশ্ব-প্রকৃতির ভিতর দিয়া আত্মোপলব্ধির একটা নিগূঢ় আনন্দ। জড় ও চেতনের ভিতরে একই রূপ এবং একই জীবনধারা আবিষ্কার করিয়া আমরা মনের অজ্ঞাতে লাভ করি একটা পরম আত্ম-তৃপ্তি।

কাব্যের মধ্যে এই যে জীববদ্-ব্যবহারের ভিতরে আত্মোপলব্ধির আনন্দ ইহা কাব্যানন্দ হইতে ভিন্ন জাতীয় নহে; কাব্যানন্দের সহিত রহিয়াছে ইহার নিবিড় সংযোগ; তাই সে কাব্যানন্দ হইতে সম্পূর্ণ পৃথকভাবে আমাদিগকে তৃপ্ত করে না। কাব্যানন্দের ভিতরেই সর্বদা থাকে একটা আত্মোপলব্ধির আনন্দ,—বিশ্বসৃষ্টির সকল সৌন্দর্য-মাধুর্য,—সকল ক্ষুদ্রত্ব, বিরাটত্ব,—সকল হাসিকান্নার ভিতর দিয়া নিজের আন্তর সত্তাকেই প্রতিনিয়ত সাহিত্যের ভিতরে আমরা গভীরভাবে উপলব্ধি করি। আমার মনে হয়, সাহিত্যে জীববদ্-ব্যবহারের ভিতরে যে আত্মানুভূতির আনন্দ, তাহা কাব্যের এই মূল আত্মানুভূতির আনন্দকেই আরও বাড়াইয়া দেয়, এইখানেই কাব্যে জীববদ্-ব্যবহারের সার্থকতা।

একেবারে প্রাচীন যুগের সাহিত্যে আমরা দেখিতে পাই, এই জীববদ্-ব্যবহার রূপ লইয়াছিল অসংখ্য দেবদেবী, পৈরী, জল-কন্যা প্রভৃতির ভিতরে। দেবকন্যা, জলকন্যা, পৈরী, ভূত-প্রেত প্রভৃতির আবির্ভাবে জগতের মধ্যযুগের সাহিত্য ভরিয়া রহিয়াছে। কিন্তু যত দিন যাইতে লাগিল, ততই সাহিত্যের ভিতরে এই জীববদ্-ব্যবহার একটা সূক্ষ্ম গভীর রূপ গ্রহণ করিতে লাগিল। আমরা বহিঃপ্রকৃতির ভিতরে দেবদেবীর আবিষ্কার না করিয়া বহিঃপ্রকৃতিকেই চেতন ধর্মে উজ্জীবিত করিয়া তুলিতে লাগিলাম।

এই জীববদ্-ব্যবহারের মধ্যেও কালিদাসের একটা স্পষ্ট স্বাতন্ত্র্য রহিয়াছে। কালিদাসের চোখের সম্মুখে বহিঃপ্রকৃতি যেন সর্বদাই একান্ত সজীব এবং সচেতন। কালিদাসের বহিঃ-প্রকৃতি সম্বন্ধে এই ভাবদৃষ্টি ইউরোপীয় কোনও প্রকৃতি-কবির অনুরূপ নহে। কালিদাস কখনও বহিঃপ্রকৃতির ভিতরে কোন অশরীরী আত্মার আবিষ্কার বা সন্ধান করেন নাই,—বহিঃপ্রকৃতি তাঁহার কাছে একান্ত সজীব হইয়া উঠিয়াছে তাহার সকল জৈব প্রাণধর্মে,—তাহার সকল চেতনা-বিলাসে। ইহার ভিতরে কোন দার্শনিকতা নাই,—রহিয়াছে স্পষ্ট বাস্তব দৃষ্টি, বাস্তব অনুভূতি। 'মেঘদূত' কাব্যের ভিতরে ধূম-জ্যোতিঃ-সলিল-মরুতের সন্নিপাতে ঘটিত অচেতন মেঘই যে শুধু দৌত্যের কার্য গ্রহণ করিয়াছে তাহা নহে,—সমগ্র কাব্যখানির ভিতরেই দেখিতে পাওয়া যায়,—সমগ্র বহিঃপ্রকৃতি বিরহী যক্ষ এবং

তাহার বিরহিণী প্রিয়তমার সকল বেদনা, সকল মাধুর্য, কারুণ্য এবং বৈচিত্র্যকেই যেন বণ্টন করিয়া লইয়াছে; বল্কলাবৃতা 'সরোসিজমনুবিদ্ধং শৈবলেন', 'অনাঘ্রাতং পুষ্পং কিসলয়মলূনম্', 'অধরঃ কিশলয়রাগঃ কোমলবিটপানুকারিণৌ বাহূ' শকুন্তলা ও তপোবন দুহিতা; নগাধিরাজ হিমালয়-দুহিতা 'পর্যাপ্তপুষ্প-স্তবকাবনম্রা সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতেব' উমাও প্রকৃতিদুহিতা; সীতাকেত কবিগুরু বাল্মীকিই প্রকৃতি-দুহিতা করিয়া রাখিয়াছেন।

কালিদাসের কাব্যে অনেক স্থানে বহিঃপ্রকৃতি মানুষের সহিত সমানভাবে কাব্যের নায়ক-নায়িকার অংশ গ্রহণ করিয়াছে। এ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন,—"অভিজ্ঞান-শকুন্তল নাটকে অনসূয়া প্রিয়ংবদা যেমন, দুষ্যন্ত যেমন, তপোবন প্রকৃতিও তেমনি একজন বিশেষ পাত্র। এই মূক প্রকৃতিকে কোন নাটকের ভিতরে যে এমন প্রধান, এমন অত্যাবশ্যক স্থান দেওয়া যাইতে পারে তাহা বোধকরি সংস্কৃত সাহিত্য ছাড়া আর কোথাও দেখা যায় নাই। প্রকৃতিকে মানুষ করিয়া তুলিয়া, তাহার মুখে কথাবার্ত্তা বসাইয়া রূপকনাট্য রচিত হইতে পারে—কিন্তু প্রকৃতিকে প্রকৃত রাখিয়া তাহাকে এমন সজীব, এমন প্রত্যক্ষ, এমন ব্যাপক, এমন অন্তরঙ্গ করিয়া তোলা, তাহা দ্বারা নাটকের এত কার্য্যসাধন করাইয়া লওয়া, এ ত অন্যত্র দেখি নাই।" শকুন্তলা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ

কালিদাসের উপমায় বিশ্বপ্রকৃতি ও মানুষের যোগ

যে কথা বলিয়াছেন, 'মেঘদূত', 'কুমার-সম্ভব' প্রভৃতি কাব্য সম্বন্ধেও প্রায় সেই একই কথা বলা যাইতে পারে।

এইরূপে কালিদাসের সকল কাব্যের ভিতরেই বহিঃপ্রকৃতি ও মানুষের ভিতরে একটা গভীর একাত্মবোধ রহিয়াছে। বহিঃ-প্রকৃতিকে বর্ণনা করিতে হইলেই কবি তাই তাহাকে প্রাণ-ধর্মে চেতন-ধর্মে জীবন্ত করিয়া তুলিয়াছেন। 'কুমার-সম্ভবে' যোগ-নিমগ্ন মহাদেবের তপোবনে যখন অকাল বসন্তের আগমন হইল তখন,—

পর্যাপ্তপুষ্পস্তবকস্তনাভ্যঃ
স্ফুরৎ-প্রবালোষ্ঠমনোহরাভ্যঃ।
লতাবধূভ্যস্তরবোহপ্যবাপু
র্বিনম্রশাখা-ভুজবন্ধনানি॥ (৩।৩৯)

লতাবধূগণ আপন যৌবনের লাবণ্য-প্রাচুর্যেই যেন তরুগণের বিনম্র শাখাবাহুর বন্ধনলাভ করিয়াছিল। প্রচুর পুষ্পস্তবকে তাহাদের স্তনভার,—অচিরোদ্‌গত কিশলয়ে তাহাদের মনোহর ওষ্ঠের লাবণ্য, এই সৌন্দর্যের প্রাচুর্যের ভিতর দিয়াই যেন তাহারা প্রিয়তমের নিকট হইয়া উঠিয়াছিল সৌভাগ্যবতী। একটু লক্ষ্য করিলেই দেখিতে পাইব, 'পর্যাপ্ত পুষ্পস্তবকাবনম্রা সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতেব' উমার সহিত এই সকল ব্রততী বধূ-দিগের একটা নিগূঢ় সাজাত্য রহিয়াছে।

রঘুবংশের ভিতরেও দেখিতে পাই, রাজকুমার অজ এবং রাজকুমারী ইন্দুমতী যখন মিলিত হইল তখন,—

হস্তেন হস্তং পরিগৃহ্য বধ্বাঃ
স রাজসূনুঃ সুতরাং চকাশে।
অনন্তরাশোকলতা-প্রবালং
প্রাপ্যেব চূতঃ প্রতিপল্লবেন॥ (৭।২১)

সন্নিহিত অশোকলতার নবপল্লবকে প্রতিপল্লবের দ্বারা বিজড়িত করিয়া সহকার তরু যেমন শোভা প্রাপ্ত হয়, নবপরিণীতা বধূর হস্তে হস্ত স্থাপন করিয়া রাজকুমার অজও তেমনি শোভা পাইতে লাগিল। উৎপ্রেক্ষাটির পশ্চাতেও রহিয়াছে বৃক্ষলতাদি সম্বন্ধে একটি মধুর জীববদ্‌-ব্যবহার।

কালিদাস তরুলতার ভিতরে যে জীববদ্‌-ব্যবহার দেখাইয়াছেন তাহা শুধু একটা কবি-প্রসিদ্ধি মাত্র নহে, তাহার ভিতরে একটা স্বতন্ত্র চারুতা রহিয়াছে। মূক-বধির প্রকৃতির ভিতরে কবি যে শুধু চিরাচরিত আলঙ্কারিক মতে প্রাণ-ধর্ম আরোপ করিয়াছেন তাহা নহে,—তাহার ভিতরে কবি আবিষ্কার করিয়াছিলেন মানব জীবনের সকল সূক্ষ্ম মাধুর্য—সকল গভীর রহস্য। তাই প্রস্তাবিত বিষয়ে অপ্রস্তাবিতের ব্যবহার আরোপের ভিতরেও রহিয়াছে কালিদাসের কবি-প্রতিভার সূক্ষ্ম নৈপুণ্য। এই জীববদ্‌-ব্যবহার এবং প্রস্তাবিত বিষয়ে অপ্রস্তাবিতের আরোপের সূক্ষ্ম নৈপুণ্যে কাব্যের বিষয়টিই যে শুধু সরস হইয়া ওঠে তাহা নহে, সেখানে বিষয়-বস্তুর সরসতার সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশ-ভঙ্গিটিও একটি অপূর্ব চারুতা লাভ করে,—প্রকাশ-ভঙ্গির সেই অপূর্ব চারুতায়ই অলঙ্কারের সার্থকতা।

শকুন্তলা-নাটকে দেখিতে পাই, জল-সেচনরতা শকুন্তলা সখী-দিগকে বলিতেছে,—'এসো বাদেরিদপল্লবঙ্গুলীহিং তুবরাবেই বিঅ মং কেসররুক্‌খও, জাব ণং সম্ভাবেমি,'—অর্থাৎ বাতাসে চঞ্চল পল্লবরূপ অঙ্গুলি দ্বারা ক্ষুদ্র বকুল বৃক্ষ যেন আমাকে ইসারায় ডাকিতেছে,—উহার অনুরোধ রক্ষা করি।' এই বলিয়া শকুন্তলা বকুল গাছের নিকটে অগ্রসর হইল। প্রিয়ংবদা বলিল, 'হলা সউন্দলে এব্ব দাব মুহুত্তঅং চিট্‌ঠ জাব তুএ উপগদাএ লদা-সণাহো বিঅ অঅং কেসররুক্‌খও পড়িভাই।' —'হলা শকুন্তলে ওইখানেই মুহূর্তের জন্য দাঁড়াও,—যাহাতে তুমি কাছে যাওয়ায় ঐ বকুল গাছটি 'লতা-সনাথে'র মত শোভা পায়।'

অনসূয়া আবার শকুন্তলাকে ডাকিয়া বলিতেছে,—'হলা শকুন্তলে, এই সেই সহকারের স্বয়ংবর-বধূ নবমালিকা—যাহাকে তুমি নাম দিয়াছ বন-জ্যোৎস্না ;—ইহাকে কি বিস্মৃত হইয়াছ? শকুন্তলা বলিল,—'তখন তবে নিজকেও বিস্মৃত হইয়া যাইব'। এই বলিয়া শকুন্তলা বন-জ্যোৎস্নার সমীপবর্তী হইল এবং তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল,—'হলা রমণীএ কৃখু কালে ইমস্‌স লদাপাঅবমিহুণস্‌স বইঅরো সংবুত্তো। ণবকুসুমজোব্বণা বণজোসিণী বদ্ধপল্লবদাএ উবহোঅক্‌খমো সহআরো'। 'হলা এই রমণীয় কালে এই লতাপাদপ-মিথুনের সমাগম কাল উপস্থিত। নবকুসুম-যৌবনা এই বন-জ্যোৎস্না,—আর বদ্ধ পল্লব হেতু সহকার তরুও উপভোগক্ষম।' এই বলিয়া শকুন্তলা লতা-পাদপ-মিথুনের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। শকুন্তলাকে

এ অবস্থায় দেখিয়া ঈষৎ মুখরা প্রিয়ংবদা বলিতেছে,—অনসূয়ে শকুন্তলা কেন বন-জ্যোৎস্নার পানে অতিমাত্র তাকাইয়া আছে জান ?' অনসূয়া বলিল,—আমি কিছু ভাবি নাই, কেন বলত ?' প্রিয়ংবদা উত্তর করিল,—'জহ বণজোসিণী অণুরূপেণ পাঅবেণ সংগদা অবি ণাম এব্বং অহং বি অত্তণো অণুরূপং বরং লহেঅং ত্তি।'—'বন-জ্যোৎস্না যেমন অনুরূপ পাদপের সহিত সঙ্গত হইয়াছে, আমিও কি এইরূপ নিজের অনুরূপ বরলাভ করিতে করিতে পারিব ?—এই ভাবিয়া।'

ঈষৎ চপল এই কুমারী তাপস কন্যা তিনটির সকল কথোপকথনের পশ্চাতে রহিয়াছে আগাগোড়া একটি প্রচ্ছন্ন অর্থালঙ্কার। বন-জ্যোৎস্না এবং সহকার তরু এখানে আর মূক প্রকৃতির অংশমাত্র নহে,—তাহাদের সহিত রহিয়াছে যৌবনের প্রচ্ছন্ন আশা-আকাঙ্ক্ষা বুকে লইয়া জাগিয়া ওঠা একটি নবীন দম্পতীর অভেদ সিদ্ধান্ত; কুমারী-জীবনের সেই স্বপ্ন, সেই অভেদ-সিদ্ধান্তকে পশ্চাতে রাখিয়াই সমস্ত দৃশ্যটি এমন সজীব এবং সরস হইয়া উঠিয়াছে।

পূর্বেই বলিয়াছি, কালিদাসের কাব্যে প্রকৃতির সহিত যে মানুষের যোগ উহা পরম আত্মীয়তা-বোধ। প্রকৃতি যে তাহার কোনও একটা গভীর রহস্যময়ী আধ্যাত্মিকতার রূপে আমাদের কাছে উপস্থিত তাহা নহে,—সে আমাদের নিকট আসে তাহার রক্তমাংসের রূপ লইয়া। সেই রক্তমাংসের বাস্তব রূপের সহিত যেন আমাদের রহিয়াছে প্রত্যক্ষ নাড়ীর যোগ। বিশেষ

করিয়া সজীব তরুলতা এবং সেই তরুলতা বেষ্টিত তপোবন বা বনস্থলী কালিদাসের নিকট সর্বদাই একান্ত সচেতন। কালিদাসের কাব্যে মানুষ সর্বদা ইহাদের সুখে দুঃখে সুখী এবং দুঃখী, আবার মানুষের সুখদুঃখেও ইহারা সম-ব্যথী। সংস্কৃত-সাহিত্যে যদি সত্যকার 'সমাসোক্তি' অলঙ্কার থাকে আমার মতে তাহা 'অভিজ্ঞান-শকুন্তল' নাটকের চতুর্থ অঙ্ক। সমগ্রটি অঙ্কের পশ্চাতে প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে এই সমাসোক্তি অলঙ্কার অতি গভীররূপে। অলঙ্কার এখানে কোন শ্লোকের ভিতর দিয়া আসে নাই, সে আসিয়াছে সমগ্র অঙ্কটি জুড়িয়া; সে নাটকের কোন ভূষণ বৃদ্ধি করিতে আসে নাই; তাহাকে ব্যতীত প্রকৃতি-দুহিতা শকুন্তলাকেই তাহার সমগ্র মাধুর্যের ভিতরে অঙ্কিত করিয়া তোলা যায় না,—সে আসিয়াছে তাই শকুন্তলাকে প্রকাশ করিতে।

প্রকৃতি বিষয়ে জীববদ্-ব্যবহার এবং প্রস্তাবিত বিষয়ে অপ্রস্তাবিতের ব্যবহার আরোপ যে কত মধুর ভাবে কাব্যের মাধুর্যের সহিত মিলাইয়া দেওয়া যায়, তাহা আমরা দেখিতে পাই এই চতুর্থ অঙ্কেরই একটি ঘটনার ভিতরে। শকুন্তলার আশ্রম হইতে বিদায়ের পূর্বক্ষণে দুইটি ঋষি বালক নানাবিধ প্রসাধন-আভরণ হস্তে আসিয়া প্রবেশ করিল। গৌতমী জিজ্ঞাসা করিলেন,—'বৎস হারীত, এ সকল কোথায় পাইলে?' প্রথম বালক উত্তর করিল,—'তাত কণ্বের প্রভাবে'। গৌতমী জিজ্ঞাসা করিলেন,—'ইহা কি তবে মানসী সিদ্ধি?'—অর্থাৎ মহর্ষি কণ্ব

কি তপঃপ্রভাবে এই সকল সৃষ্টি করিয়াছেন?' দ্বিতীয় বালক উত্তর করিল,—'না, তাহা নয়—শুনুন, আপনারা আমাদিগকে আজ্ঞা করিলেন—শকুন্তলার জন্য বনস্পতিদের নিকট হইতে কুসুম আহরণ করিয়া আনিতে,—আমরাও গিয়া দেখি—

ক্ষৌমং কেনচিদিন্দুপাণ্ডু-তরুণা মাঙ্গল্যমাবিষ্কৃতং
নিষ্ঠ্যূতশ্চরণোপরাগসুভগো লাক্ষারসঃ কেনচিৎ।
অন্যেভ্যো বন-দেবতা-কর-তলৈরাপর্বভাগোত্থিতৈ-
র্দত্তান্যাভরণানি তৎকিসলয়োদ্ভেদ-প্রতিদ্বন্দ্বিভিঃ॥

চন্দ্রের ন্যায় পাণ্ডুবর্ণ কোন বৃক্ষ মঙ্গল কার্যের উপযোগী ক্ষৌম বস্ত্র প্রদান করিয়াছে,—কোন বৃক্ষ চরণের উপরঞ্জনযোগ্য তরল অলক্তক রস ক্ষরণ করিয়াছে,—অন্যান্য তরুগণের ভিতর দিয়াও বনের দেবতাগণ তাহাদের আরক্তিম নবকিশলয় করতল দ্বারা একে যেন অপরের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া বহু আভরণ দান করিয়াছে।' সম্মিলিত তপোবন-তরুগণের নব-পল্লবের আরক্তিম কোমল হস্ত দ্বারা বন-দেবতাগণই যেন পতিগৃহগামিনী শকুন্তলাকে মঙ্গল উপহার পাঠাইয়াছে। আশ্রমের তরুলতা-গণের শকুন্তলার পতিগৃহে যাত্রাক্ষণে এই মঙ্গল উপহার পাঠাইবার যথেষ্ট কারণ রহিয়াছে,—সে কারণ শকুন্তলার সহিত এই সকল তরুলতার সাক্ষাৎ সম্বন্ধ—নাড়ীর যোগ। তাই শকুন্তলার পতিগৃহে যাত্রাকালে তাত কণ্ব বলিলেন,—

পাতুং ন প্রথমং ব্যবস্যতি জলং যুষ্মাস্বপীতেষু যা
নাদত্তে প্রিয়মণ্ডনাপি ভবতাং স্নেহেন যা পল্লবম্।

আদ্যে বঃ কুসুম-প্রসূতি-সময়ে যস্যা ভবত্যুৎসবঃ
সেয়ং যাতি শকুন্তলা পতিগৃহং সর্বৈরনুজ্ঞায়তাম্॥

'হে সন্নিহিত তরুগণ,—তোমাদের জলপান করিবার পূর্বে যে নিজে কখনও জলপান করিত না, অর্থাৎ তোমাদের জল সেচন করিবার পূর্বে যে জল পান করিত না,—ভূষণপ্রিয়া হইয়াও স্নেহবশত যে কখনো তোমাদের পল্লব ছিঁড়িয়া গ্রহণ করিত না, তোমাদের কুসুম-প্রসবের সময়ে যাহার মনে আনন্দের উৎসব জাগিত,—সেই শকুন্তলা পতিগৃহে যাইতেছে, তোমরা সকলে তাহাকে গমনের আদেশ দাও।' মহর্ষির এ-বাক্যে তপোবন কোকিল-কণ্ঠের দ্বারা সাড়া দিয়াছিল।

শকুন্তলা প্রিয়ংবদাকে বলিয়াছিল,—সখি প্রিয়ংবদে, আর্য্যপুত্রকে দেখিবার জন্য উৎসুক হইলেও আশ্রম পরিত্যাগ করিয়া যাইতে আমার চরণ উঠিতেছে না। প্রিয়ংবদা উত্তর করিল, সখি তুমিই যে শুধু তপবন বিরহে কাতর তাহা নহে, তোমার বিরহে তপোবনেরও সেই একই অবস্থা।

উগ্‌গলিঅ-দব্‌ভ-কবলা মআ পরিচ্চত্ত-ণচ্চণা মোরা।
ওসারিঅ-পাণ্ডুপত্তা মুঅন্তি অস্‌সু বিঅ লদাও॥

মৃগগুলির মুখ হইতে কুশের গ্রাস স্খলিয়া পড়িতেছে, ময়ূরগুলি নৃত্য পরিত্যাগ করিয়াছে, আর লতাসমূহ হইতে পাণ্ডুপত্রগুলি ঝরিয়া পড়িতেছে, তাহারাও যেন বিরহে অশ্রু বিসর্জন করিতেছে।

ইহার পর শকুন্তলা বনতোষিণী লতাটিকে স্মরণ করিয়া তাহার নিকটে গিয়া বলিল,—'বণজোসিণী চূদসংগদা বি মং

পচ্চালিঙ্গ ইদোগদাহিং সাহাবাহাহিং। অজ্জপ্ পহুই দূরপরি-বট্টিণী দে ভবিস্সম্।' 'হে বনতোষিণী, আজ তুমি চূত-সঙ্গতা হইলেও শাখা বাহু এই দিকে প্রসারিত করিয়া একবার আমাকে প্রত্যালিঙ্গন কর,—আজ হইতে আমি তোমার নিকট হইতে দূরবর্তিনী হইলাম।'

মহর্ষি কণ্ব বলিলেন,—

> সংকল্পিতং প্রথমমেব ময়া তবার্থে
> ভর্তারমাত্মসদৃশং সুকৃতৈর্গতা ত্বম্।
> চূতেন সংশ্রিতবতী নবমালিকেয়ম্
> অস্যামহং ত্বয়ি চ সম্প্রতি বীত-চিন্তঃ ॥

'শকুন্তলে, আমি প্রথমেই তোমার জন্য যেরূপ সঙ্কল্প করিয়াছিলাম, সুকৃতিবশে ঠিক সেইরূপই তুমি আত্ম-সদৃশ স্বামী লাভ করিয়াছ। আর এই নবমালিকা লতা সম্বন্ধেও আমার সঙ্কল্প অনুরূপ আম্রতরুরই আশ্রয় সে লাভ করিয়াছে; সম্প্রতি তোমার বিষয়ে এবং এই বনতোষিণীর বিষয়ে আমি নিশ্চিন্ত হইলাম।' তাহা হইলে দেখিতেছি, বনতোষিণীর সহিত শকুন্তলারই যে শুধু সহোদরা ভাব তাহা নহে, তাত কণ্বেরও বন-তোষিণী এবং শকুন্তলা এই দুইটি উদ্যান লতার প্রতি রহিয়াছে সমান পিতৃস্নেহ,—উভয়ই কুমারী কন্যা,—উভয়কেই অনুরূপ স্বামীর হস্তে দান করিয়া কন্যাদায় মুক্ত পিতা আজ নিশ্চিন্ত।

আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, কালিদাসের কাব্যে প্রকৃতি সম্বন্ধে এই যে জীববদ্-ব্যবহার এবং মানুষের সহিত এই যে তাহার

আন্তরিক যোগ, তাহা শুধু কালিদাসের কাব্যের বিষয়-বস্তুকেই মহিমা দান করে নাই, সে মধুরতর করিয়া তুলিয়াছে কাব্যের প্রকাশ-ভঙ্গিকে চিত্রের পরে চিত্র দ্বারা; মানুষের জীবনের একটি সুকুমার অধ্যায়কে কথার তুলিতে কাব্যে আঁকিয়া তুলিতে তিনি বিশ্ব-প্রকৃতিকে শুধু পটভূমিরূপে গ্রহণ করেন নাই,—প্রকৃতির প্রবাহকে তিনি গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহার চিত্রগুলিতে জীবনের সম-পর্যায়ে ফেলিয়া।

শুধু শকুন্তলা নাটকেই যে প্রকৃতির সহিত মানুষের এই আন্তরিক যোগের আমরা সন্ধান পাই তাহা নহে,—প্রকৃতির সহিত মানুষের এই নাড়ীর যোগ, ভাবের এই আদান-প্রদান রহিয়াছে কালিদাসের কাব্যে প্রায় সর্বত্র। 'রঘুবংশে'র দ্বিতীয় সর্গে দেখিতে পাই, রাজা দিলীপ মুনির ধেনুর পরিচর্যার জন্য সমস্ত পার্শ্বানুচর ত্যাগ করিয়া বনে বিচরণ করিতেছেন। কিন্তু কবি বলিতেছেন, সেই বনস্থলী মহারাজ দিলীপকে পার্শ্বচরবিহীনভাবে বিচরণ করিতে দিল না,—

কালিদাসের উপমায় মানুষ ও প্রকৃতিতে ভাবের আদান প্রদান

বিসৃষ্টপার্শ্বানুচরস্য তস্য
পার্শ্বদ্রুমাঃ পাশভৃতা সমস্য।
উদীরয়ামাসুরিবোন্মদানাম্
আলোকশব্দং বয়সাং বিরাবৈঃ॥ (২।৯)

বরুণ-সদৃশ মহারাজ দিলীপ সমস্ত পার্শ্বানুচর ত্যাগ করিলেও বনের তরুরাজিই তাঁহার পার্শ্বচর হইয়াছিল; উন্মদ বিহঙ্গ-

কাকলীতে তাহারা সকলে মিলিয়া মহারাজ দিলীপের জয়ধ্বনি করিতে লাগিল।

শুধু যে তরুগণই শ্রেণীবদ্ধভাবে দাঁড়াইয়া পার্শ্বচরের ন্যায় জয়ধ্বনি করিতেছিল তাহা নহে,—

মরুৎ-প্রযুক্তাশ্চ মরুৎসখাভং
তমর্চ্যমারাদভিবর্তমানম্।
অবাকিরন্ বাললতাঃ প্রসূনৈ-
রাচারলাজৈরিব পৌর-কন্যাঃ॥ (২।১০)

অগ্নির প্রতিমূর্তি রাজা দিলীপের মস্তকে সেই বনস্থলীতেও পৌরকন্যাগণের লাজ-বর্ষণ হইয়াছিল,—সমীরণে ঈষৎ আন্দোলিত বাললতাগুলি পৌরকন্যাগণের ন্যায় তাঁহার মস্তকে শুভ্র প্রসূনের লাজাঞ্জলি দিতেছিল। রাজা এখানে 'মরুৎ-সখাভ'—যেন অগ্নির প্রতিমূর্তি; আর অগ্নিসদৃশ রাজার আগমনে বাতাস আসিয়া আপনি মিলিয়াছিল, সে বাতাস যেন রাজদর্শনে একটা আনন্দের বন্ধনহীন প্রবাহ মাত্র,—বাললতারূপ পৌর-কন্যাদের হাত হইতে সে ছড়াইয়া গেল শুভ্র ফুলের লাজাঞ্জলি।

আনন্দের দিনেই যে প্রকৃতির এই অভ্যর্থনা তাহা নহে,—মানুষের দুঃখেও তাহার রহিয়াছে গভীর সমবেদনা। ইন্দুমতীর বিবাহে রাজা অজ যেদিন করুণ বিলাপধ্বনি তুলিয়াছিল সেদিনও,—

বিলপন্নিতি কোসলাধিপঃ
করুণার্থগ্রথিতং প্রিয়াং প্রতি।

অকরোৎ পৃথিবীরুহানপি
স্রুতশাখারস-বাষ্প-দূষিতান্ ॥ (৮।৭০)

প্রিয়ার জন্য কোসলাধিপ অজ যখন করুণ বাক্যে বহু বিলাপ করিলেন, সেই বিলাপের দ্বারা তিনি পৃথিবীর তরুরাজিকেও অশ্রুবাষ্পে ভরিয়া দিয়াছিলেন; শাখারস স্রুত হইয়াই যেন তরুগণকে বাষ্প-দূষিত করিয়া দিতেছিল।

রামচন্দ্রও সীতাকে লইয়া বিমান-যোগে লঙ্কা হইতে ফিরিবার পথে সীতাকে বলিতেছিলেন,—

এতদ্‌গিরের্মাল্যবতঃ পুরস্তাদ্
আবির্ভবত্যম্বরলেখি শৃঙ্গম্।
নবং পয়ো যত্র ঘনৈর্ময়া চ
ত্বদ্‌বিপ্রযোগাশ্রু সমং বিসৃষ্টম্ ॥ (১৩।২৬)

ঐ দেখ সম্মুখে মাল্যবান পর্বতের অভ্রভেদী শৃঙ্গগুলি চোখের নিকটে আসিতেছে; এখানে তোমার বিয়োগে আমি অনেক অশ্রু পাত করিয়াছি। জলভরা নবীন মেঘও এখানে আমার সঙ্গে অনেক অশ্রু বিসর্জন করিয়াছে; মাল্যবানের শিখরে আমি আর মেঘ তোমার বিরহে সমান ভাবেই অশ্রু-বিসর্জন করিয়াছি; 'ত্বদ্‌বিপ্রযোগাশ্রু সমং বিসৃষ্টম্'!

লক্ষ্মণ যেদিন সীতাকে জাহ্নবী পুলিনে লইয়া আসিয়া তাহাকে রামের নির্বাসন বাণী শুনাইয়াছিল, সেদিন ধরণী-দুহিতা সীতা বাতাহতা বল্লরীর ন্যায় ধরিত্রী-মায়ের কোলেই লুটাইয়া পড়িয়াছিল।

তততোঽভিষঙ্গানিলবিপ্রবিদ্ধা
প্রভ্রশ্যমানাভরণপ্রসূনা।
স্বমূর্তিলাভ-প্রকৃতিং ধরিত্রীং
লতেব সীতা সহসা জগাম্॥ (১৪।৫৪)

সেই বিপদের বাতাসে আহত সীতা তাহার রত্নালঙ্কাররূপ কুসুমগুলি ছড়াইয়া দিয়া লতার ন্যায় আপন জননী ধরিত্রীর কোলে আপনার দেহভার লুটাইয়া দিল। কারুণ্যকে কবি আরও কত করুণ করিয়া তুলিতে পারেন! মাতা ধরিত্রী যে বিপদের ঘায়ে লুটিয়া-পড়া অসহায়া কন্যার এই তীব্র বেদনায় আকুল হইয়া ওঠেন নাই তাহা নহে। সীতা মুহূর্তের জন্য ধৈর্য ধরিয়া লক্ষ্মণকে অনেক কথা বলিয়াছিল, কিন্তু লক্ষ্মণ ধীরে ধীরে চক্ষের অন্তরাল হইতেই বাণবিদ্ধা কুররীর ন্যায় সীতা মুক্ত কণ্ঠে কাঁদিয়া পড়িল। তখন করুণ বিলাপিনী সীতার সেই বুকভাঙা ক্রন্দনে সমগ্র বনস্থলীও যেন সহসা কাঁদিয়া উঠিল।

নৃত্যং ময়ূরাঃ কুসুমানি বৃক্ষাঃ
দর্ভানুপাত্তান্ বিজুহুর্হরিণ্যঃ।
তস্যাঃ প্রপন্নে সমদুঃখভাবম্
অত্যন্ত মাসীদ্রুদিতং বনেঽপি॥ (১৪।৬৯)

ময়ূরগণ নৃত্য পরিত্যাগ করিল,—বৃক্ষগণ ঝর্ ঝর্ করিয়া কুসুমাশ্রু বর্ষণ করিল,—হরিণের মুখ হইতে অর্ধ-কবলিত কুশগুচ্ছ স্খলিয়া পড়িল। সমগ্র বনস্থলীই যেন সমবেদনায় সীতার ন্যায়ই আকুল অশ্রু বিসর্জন করিতে লাগিল।

'মেঘদূতে' বিরহী যক্ষও বলিতেছে,—

মামাকাশপ্রণিহিতভুজং নির্দয়াশ্লেষহেতোঃ
লব্ধায়াস্তে কথমপি ময়া স্বপ্নসন্দর্শনেষু।
পশ্যন্তীনাং ন খলু বহুশো ন স্থলী দেবতানাং
মুক্তাস্থূলাস্তরুকিশলয়েষ্বশ্রুলেশাঃ পতন্তি ॥ (উ। ৪৫)

হে প্রিয়তমা, স্বপ্নে আমি অতিকষ্টে তোমাকে লাভ করিয়া গাঢ় আলিঙ্গনের জন্য যখন শূন্যে বাহুযুগল প্রসারিত করি, তাহা দেখিয়া যে বন-দেবতাগণ প্রচুর অশ্রু বর্ষণ করে না তাহা নহে,—তাহাদের তরু কিশলয়রূপ স্থূল মুক্তার অশ্রু বেদনায় ঝরিয়া পড়ে।

'কুমার-সম্ভবে' দেখিতে পাই,—প্রবল ঝঞ্চাময়ী বৃষ্টির ভিতরেও অনাবৃত স্থানে শিলাতলশায়িনী উমাকে যেন তাহার এই মহাতপস্যার সাক্ষীভূতা রজনীগুলি বিদ্যুতের নয়ন উন্মীলন করিয়া দেখিতে লাগিল।

শিলাশয়াং তামনিকেতবাসিনীং
নিরন্তরাস্বন্তরবাতবৃষ্টিষু।
ব্যলোকয়ন্নুন্মিষিতৈ স্তড়িন্ময়ৈ-
র্মহাতপঃ সাক্ষ্য ইব স্থিতাঃ ক্ষপাঃ ॥ (৫।২৫)

ইহা শুধু বর্ণনা নহে,—প্রত্যেকটি কথার ভিতর দিয়া যেন মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে মানুষের সহিত বিশ্বপ্রকৃতির অন্তরতম যোগ। উমা তাহার কোমল অঙ্গে পার্বত্য বিজনে নৈশ অন্ধকারের ভিতরে যে কি কঠোর তপস্যা করিতেছে, তাহা

দেখিবার আর কেহই ছিল না ; সেই মহাতপস্যার সাক্ষী হইয়া রহিল সেই ঝঞ্ঝাময়ী মহানিশাগুলি তাহাদের বিদ্যুতের চাহনির ভিতর দিয়া।

কালিদাস বহিঃপ্রকৃতি ও মানুষের ভিতরে গভীর আত্মীয়তাবোধ লইয়া যত উপমার ছবি আঁকিয়াছেন, তাহার ভিতরে একটি অভিনব চিত্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরুলতার সম্বন্ধে নারীর মহিমাময়ী মাতৃমূর্তি। আমরা শকুন্তলা নাটকের প্রথম অঙ্কে দেখিয়াছি, অনসূয়াকে শকুন্তলা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আশ্রম-তরুলতাগুলি সম্বন্ধে বলিয়াছিল,—'ণ কেঅলং তাদ-ণিওও এব্ব অত্থি মে সোদরসিণেহ বি এদেসু।' —শুধু তাত কণ্বের নিয়োগই যে এক মাত্র কথা তাহা নহে, আমার নিজেরও ইহাদের প্রতি একটা সোদর স্নেহ রহিয়াছে। এই বলিয়া শকুন্তলা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরুলতার মূলে কক্ষের কলসী হইতে জল সেচন করিয়াছিল। অন্যত্র কবি বলিতেছেন, এই জল-সিঞ্চন যেন মাতৃবক্ষের স্নেহ সিঞ্চন,—যেন ঘটরূপ স্তন হইতে মাতৃবক্ষের দুগ্ধ সিঞ্চন। 'কুমার-সম্ভবে' তপস্বিনী উমার ভিতরে স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে কুমারীর সেই মহিমাময়ী মাতৃমূর্তি।—

কালিদাসের উপমায় অভিনব মাতৃমূর্তি

অতন্দ্রিতা সা স্বয়মেব বৃক্ষকান্
ঘটস্তনপ্রস্রবণৈর্ব্যবর্ধয়ৎ।
গুহোঽপি যেষাং প্রথমাপ্তজন্মনাং
ন পুত্রবাৎসল্যমপাকরিষ্যতি॥ (৫।১৪)

অতন্দ্রিতা তপস্বিনী উমা ঘটরূপ স্তনের প্রস্রবণ দ্বারা নিজেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃক্ষগুলিকে বাড়াইয়া তুলিতে লাগিল। সেই বৃক্ষ-শিশুদের উপরে কুমারী উমার এমন পুত্রবাৎসল্য জন্মিয়া গিয়াছিল যে, পরবর্তী কালে কুমার কার্তিকও সে পুত্রবাৎসল্য হ্রাস করিতে পারে নাই। 'রঘুবংশে'র ভিতরেও দেখিতে পাই মায়াসিংহ রাজা দিলীপকে বলিতেছে,—

> অমুং পুরঃ পশ্যসি দেবদারুং
> পুত্রীকৃতোঽসৌ বৃষভধ্বজেন।
> যো হেমকুম্ভস্তননিঃসৃতানাং
> স্কন্দস্য মাতুঃ পয়সাং রসজ্ঞঃ॥ (২।৩৬)

'ঐ দূরে দেবদারু দেখিতেছেন কি? বৃষভধ্বজ শিব উহাকে নিজের পুত্র করিয়া লইয়াছেন। এই দেবদারু গাছ কুমার স্কন্দের মাতা পার্বতীর হেমকুম্ভরূপ স্তন হইতে নিঃসৃত দুগ্ধ-ধারার আস্বাদ লাভ করিতে পারিয়াছে।' নারীর মাতৃ-হৃদয়ের সহিত প্রকৃতিমায়ের দুলাল এই সব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃক্ষলতাদির সহিত যে কি নিবিড় সংযোগ থাকিতে পারে তাহা এমন করিয়া আর কোথাও দেখিতে পাই নাই;—'হেমকুম্ভ-স্তন-নিঃসৃতানাং পয়সাং রসজ্ঞঃ!' ইহার ভিতর দিয়া যে শুধু প্রকৃতির সহিত মানুষের গভীর আত্মীয়তাই প্রকাশ পাইয়াছে তাহা নহে,—ইহার ভিতর দিয়া প্রকাশ পাইয়াছে বিশ্ব-নারী-হৃদয়ে সঞ্চিত অফুরন্ত মাতৃত্বের স্নেহময়ী মহিমাময়ী মূর্তি। পরের শ্লোকেই দেখিতে পাই,—

কণ্ডূয়মানেন কটং কদাচিৎ
বন্যদ্বিপেনোন্মথিতা ত্বগস্য।
অথৈনমদ্রেস্তনয়া শুশোচ
সেনান্যমালীঢ়মিবাসুরাস্ত্রৈঃ॥ (২।৩৭)

একদিন একটি বন্যহস্তী গাত্র ঘর্ষণ করিয়া এই দেবদারুর ত্বক উন্মথিত করিয়া দিয়াছিল,—তাহাতে গিরিদুহিতা পার্বতী ইহার জন্য ঠিক তেমন করিয়াই শোক করিয়াছিলেন, যেমন শোক করিয়াছিলেন তিনি অসুরগণ কর্তৃক ক্ষতবিক্ষত কুমার কার্তিকের অঙ্গ দেখিয়া।

বনে নির্বাসিত সীতাকেও মহর্ষি বাল্মীকি বলিয়াছিলেন,—

পয়োঘটৈরাশ্রমবালবৃক্ষান্
সংবর্ধয়ন্তী স্ববলানুরূপৈঃ।
অসংশয়ং প্রাক্তনয়োপপত্তেঃ
স্তনন্ধয়-প্রীতিমবাপ্স্যসি ত্বম্॥ (১৪৭৮)

হে সীতা, তুমি নিজের বলের অনুরূপ জলঘটের দ্বারা আশ্রমের বালবৃক্ষগুলিকে বাড়াইয়া তুলিয়া নিশ্চয়ই সন্তান জন্মের পূর্বে স্তন্যদানের প্রীতি লাভ করিবে। স্নেহময়ী নারীর পক্ষে বালবৃক্ষকে ছোট্ট কলসীর জলে বাড়াইয়া তুলিবার ভিতরে কি যে একটা অনির্বচনীয় মাধুর্যভরা মহিমা রহিয়াছে, তাহা কবি কালিদাসের চোখে যেমন করিয়া পড়িয়াছিল, তেমন বুঝি আর কাহারও চোখে পড়ে নাই।

কালিদাস তাঁহার কাব্যে বৃক্ষলতাদি-পরিবেষ্টিত সজীব প্রকৃতিকেই যে শুধু চেতনা দান করিয়াছিলেন তাহা নহে।

নদনদী, পাহাড়-পর্বত, বাতাস, মেঘ প্রভৃতি তাঁহার কাব্যের ভিতরে সজীব হইয়া চেতনা-ধর্মে উদ্বুদ্ধ হইয়াছে। কৈলাসপর্বতে অবস্থিত অলকাপুরীর বর্ণনা দিতে গিয়া কবি 'মেঘদূতে' বলিয়াছেন,—

জড় প্রকৃতি ও কালিদাসের উপমা

তস্যোৎসঙ্গে প্রণয়িন ইব স্রস্তগঙ্গাদুকূলাং
ন ত্বং দৃষ্ট্বা ন পুনরলকাং জ্ঞাস্যসে কামচারিম্।

কৈলাস-পর্বতের ক্রোড়দেশে যে সুন্দরী অলকাপুরী, সে যেন প্রণয়ীর কোলে আত্ম-সমর্পিতা প্রণয়িনী,—আর সেই পাহাড়ের বুকে অলকাপুরীকে বেষ্টন করিয়া আঁকিয়া বাঁকিয়া নামিয়াছে যে তুষার-ধবল-গঙ্গা যে যেন সেই প্রণয়িণীর বিগলিত দুকূল বস্ত্র! 'স্রস্তগঙ্গাদুকূলাম্!'

'ঋতুসংহারে'র শরৎ-বর্ণনার ভিতরে দেখিতে পাই,—

চঞ্চন্মনোজ্ঞশফরীরসনাকলাপাঃ
পর্যন্ত-সংস্থিতসিতাণ্ডজ-পঙক্তিহারাঃ।
নদ্যো বিশালপুলিনান্তনিতম্ববিম্বা
মন্দং প্রয়ান্তি প্রসমদাঃ মদা ইবাদ্য॥

শরতের নদী মদালসা মন্থরগামিনী নারী। চঞ্চল মনোহর শ্বেত শফরী গুলি যেন তাহার শ্বেত কাঞ্চীদাম,—দুই কূলে শ্বেত হংসমালা যেন কণ্ঠের হার,—আর বিশাল পুলিনদেশ যেন

তাহার নিতম্ব। 'বিক্রমোর্বশী'র ভিতরেও দেখিতে পাই,—

তরঙ্গভ্রূভঙ্গা ক্ষুভিতবিহগ-শ্রেণিরশনা
বিকর্ষন্তী ফেনং বসমিব সংরম্ভশিথিলম্।
যথাবিদ্ধং যাতি স্খলিতমাভিসন্ধায় বহুশো
নদীভাবেনেয়ং ধ্রবমসহনা সা পরিণতা ॥

ক্রুদ্ধা মানিনী প্রিয়তমা আজ যেন এই নদীর রূপ ধারণ করিয়া চলিয়া যাইতেছে। তরঙ্গমালা যেন তাহার ভ্রূভঙ্গ,—চঞ্চল বিহগশ্রেণী তাহার কাঞ্চীদাম—ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ফেনপুঞ্জ যেন সেই ক্রোধকম্পিতাঙ্গীর স্খলিতপ্রায় বসন,—তাই হাত দিয়া ত্রস্তে যেন তাহা সংবরণ করিয়া লইতেছে। বন্ধুর পথে প্রতিহতা নদী যেন উচ্ছলবেগে ক্রোধে বেপথুমতী দয়িতার ন্যায়ই সবেগে চলিয়া যাইতেছে।

'রঘুবংশের'র ভিতরে দেখিতে পাই,—তরঙ্গক্ষুব্ধ সমুদ্রবক্ষে মেঘ ঘুরিয়া মরিতেছে।—

প্রবৃত্তমাত্রেণ পয়াংসি পাতু-
মার্বতবেগাদ্ ভ্রমতা ঘনেন।
আভাতি ভূয়িষ্ঠময়ং সমুদ্রঃ
প্রথম্যমানো গিরিণেব ভূয়ঃ ॥ (১৩।১৪)

কালো কালো মেঘগুলি যেন তৃষার্ত জন্তুর ন্যায় সমুদ্র হইতে জলপান করিতে আসিয়াছিল; কিন্তু জলপান করিতে প্রবৃত্ত হওয়া মাত্র আবর্তের বেগে পড়িয়া শুধু ঘুরপাক খাইয়া

মরিতেছে। দেখিয়া মনে হইতেছে, যেন মন্দর পর্বতের দ্বারা সমুদ্র পুনরায় মন্থিত হইতেছে।

'মেঘদূতে'র প্রারম্ভেও দেখিতে পাই,—

আষাঢ়স্য প্রথমদিবসে মেঘমাশ্লিষ্টসানুং
বপ্রক্রীড়া-পরিণতগজ-প্রেক্ষণীয়ং দদর্শ॥ (পূ৷২)

আষাঢ়ের প্রথম দিবসে যে ঘন কাল মেঘগুলি পর্বতের সানু-দেশ স্পর্শ করিয়াছিল তাহাকে দেখিয়া মনে হইতেছিল, প্রকাণ্ড হাতী যেন ভূমিখণ্ড সকল তুলিয়া তুলিয়া তির্যক্‌ভাবে দন্ত প্রহার করিতেছে।

জড়প্রকৃতি যে শুধু বাহিরের রূপেই মানুষ তথা সমগ্র প্রাণি-জগতের সমকক্ষ হইয়া ওঠে তাহা নহে,—মনুষ্যত্বের মহত্তর গুণগুলিতেও মানুষের সহিত এই জড়-প্রকৃতির রহিয়াছে যে সাধর্ম্য তাহাও কালিদাসের দৃষ্টি এড়ায় নাই। 'রঘুবংশে'র ভিতরে দেখিতে পাই মহারাজ দিলীপ প্রজা-গণের সব বিধ হিতের জন্যই প্রজাদের নিকট হইতে কর গ্রহণ করিতেন। কবি বলিতেছেন যে প্রকৃতির ভিতরেও ইহার দৃষ্টান্ত রহিয়াছে।

কালিদাসের উপমায় জড়-প্রকৃতি ও মনুষ্যত্বের মহত্তর গুণ

সহস্রগুণমুৎস্রষ্টুমাদত্তে হি রসং রবিঃ॥ (১৷১৮)

সূর্য যেমন পৃথিবীর যেখানে আছে যত কিছু অপরিষ্কৃত, অপরি-শুদ্ধ, দুর্গন্ধযুক্ত জল সকল নিজের কিরণরূপ রাজকর্মচারিগণের সাহায্যে গ্রহণ করে,—কিন্তু প্রতিদানে ফিরাইয়া দেয় যে স্বচ্ছ শুদ্ধ বারিধারা তাহা গৃহীত ধনের সহস্রগুণ বেশী। 'রঘুবংশে'র

চতুর্থ সর্গেও দেখিতে পাই, রাজা রঘু প্রজাদের নিকট হইতে যত কিছু সম্পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন, বিশ্বজিৎ যজ্ঞ করিয়া দক্ষিণাস্বরূপে সেই সমস্ত ধনই আবার প্রদান করিয়াছিলেন। কবি বলিতেছেন, সৎব্যক্তি যাঁহারা তাঁহারা প্রদানের জন্যই গ্রহণ করেন,—যেমন বাষ্পরূপে গ্রহণকারী এবং ধারাসার রূপে বর্ষণকারী মেঘ।

> স বিশ্বজিতমাজহ্রে যজ্ঞং সর্বস্ব-দক্ষিণম্।
> আদানং হি বিসর্গায় সতাং বারিমুচামিব॥ (৪।৮৬)

'অভিজ্ঞান-শকুন্তলে'র পঞ্চম অঙ্কে দেখিতে পাই,—যূথপতি হস্তী যেমন সারাদিন প্রখর রৌদ্রে যূথ চরাইয়া মধ্যাহ্নে একটু ছায়াতলে আসিয়া বিশ্রাম গ্রহণ করে, মহারাজ দিলীপও তেমনই সারাদিন রাজকার্য করিয়া একটু বিশ্রামের জন্য অন্দরে গিয়াছেন। এখনই আবার রাজাকে আশ্রম হইতে সমাগত মুনিগণ ও শকুন্তলার সংবাদ জানাইতে কঞ্চুকী ইতস্তত করিতেছিল; কিন্তু পরক্ষণেই আবার ভাবিল, 'অথবা অবিশ্রমো লোকতন্ত্রাধিকারঃ'—লোকতন্ত্রাধিকারের আর বিশ্রাম নাই।—

> ভানুঃ সকৃদ্‌যুক্ততুরঙ্গ এব
> রাত্রিন্দিবং গন্ধবহঃ প্রয়াতি।
> শেষঃ সদৈবাহিত-ভূমিভারঃ
> ষষ্ঠাংশবৃত্তেরপি ধর্ম এষঃ॥

সূর্য একবার যে রথে অশ্ব-যোজনা করিয়াছেন, আর ক্ষান্ত হন নাই,—গন্ধবহ রাত্রিদিনই প্রবাহিত হইতেছে, শেষনাগ সর্বদার

জন্যই মস্তকে ভূমিভার বহন করিতেছে, ষষ্ঠাংশবৃত্তি রাজারও ইহাই ধর্ম। ইহার পরে বৈতালিক রাজা দুষ্যন্তের যশোগান করিতেছে,—

স্ব-সুখ-নিরভিলাষঃ খিদ্যসে লোকহেতোঃ
প্রতিদিনমথবা তে সৃষ্টিরেবংবিধৈব।
অনুভবতি হি মূর্ধ্না পাদপস্তীব্রমুষ্ণং
শময়তি পরিতাপং ছায়য়া সংশ্রিতানাম্॥

হে মহারাজ, নিজের সুখে নিরভিলাষ হইয়া আপনি প্রতিদিন প্রজাগণের জন্য ক্লেশ বরণ করিতেছেন,—অথবা আপনার ন্যায় ব্যক্তিগণের জন্ম যেন এইরূপ কাজ করিবারই জন্য,—পাদপ নিজে মাথা পাতিয়া প্রখর সূর্যকিরণ সহ্য করে;—কিন্তু তাহার নীচে যাহারা আশ্রয় গ্রহণ করে তাহাদের গায়ে সে এতটুকুও তাপ লাগিতে দেয় না,—নিজের শীতল ছায়ায় সব ঢাকিয়া রাখে। শার্ঙ্গরবও রাজা দুষ্যন্তের বিনয় দেখিয়া বলিয়াছিলেন,—

ভবন্তি নম্রাস্তরবঃ ফলাগমৈঃ
নবাম্বুভির্দূরবিলম্বিনো ঘনাঃ।
অনুদ্ধতাঃ সৎপুরুষাঃ সমৃদ্ধিভিঃ
স্বভাব এবৈষ পরোপকারিণাম্॥

তরুগণ ফলাগমে নুইয়া পড়ে,—নবজলভারে মেঘগুলি নুইয়া পড়ে,—সমৃদ্ধিতে সৎপুরুষগণ অনুদ্ধত হন,—পরোপকারিগণের ইহাই স্বভাব।

উপমার কথা আলোচনা করিতে গিয়া আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে উপমা ভাষার চিত্রধর্ম, এবং এ কথাটিও আমরা স্পষ্ট করিয়া দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে, আমাদের বোঝন-ক্রিয়াটি সম্পূর্ণ না হইলেও অনেকখানিই নির্ভর করে ভাষার চিত্রধর্মের উপরে। একেবারে শুদ্ধ শব্দজন্য জ্ঞানের মতবাদকে আমরা ব্যবহারিক ক্ষেত্রে মানিয়া লইতে পারি না। তা ছাড়া এ কথারও আমরা আভাস দিয়াছি যে, এই শুদ্ধ 'শব্দে'র ইতিহাসের পশ্চাতেই কোথায় যে লুকাইয়া আছে প্রাকৃতিক কোন বস্তু বা ঘটনার অনুকৃতি তাহাও আজ আমরা হয়ত ভুলিয়া গিয়াছি,—আজ হয়ত বায়ুমণ্ডলের ধ্বনি-কম্পনের সঙ্গে সঙ্গে তাহা আমাদের অবচেতন লোকে দোলা দিতেছে। অবশ্য বস্তুকে আমরা যখন বুঝি তখন সেই জ্ঞানক্রিয়ার ভিতরে বস্তুর বাস্তব রূপটিই থাকে, অথবা শুধু তাহার সম্বন্ধে গঠিত মানসিক বৃত্তিটিই থাকে, অথবা তাহাকে আমরা শুধু শব্দজন্য জ্ঞানের দ্বারাই বুঝিয়া লই, ইহা লইয়া পণ্ডিত মহলে যথেষ্ট মতভেদ রহিয়াছে। কিন্তু সে সকল সূক্ষ্ম তর্কজালের ভিতরে প্রবেশ না করিয়াও সাধারণ বুদ্ধিতে দেখিতে পাই,—সেই জিনিসকেই আমরা বুঝিতে পারি সবচেয়ে ভাল করিয়া যাহা আমাদের মানসলোকে ভাসিয়া ওঠে একান্ত প্রত্যক্ষ হইয়া। এই জন্যই আমাদের বস্তু-বিয়োজিত (abstract) চিন্তাগুলিকে আমরা যতই রূপের ভিতরে মূর্ত করিয়া তুলিতে পারি,—আমাদের

বস্তু-বিয়োজিত চিন্তা-প্রকাশে উপমার সার্থকতা

বোঝন-ক্রিয়াটি ততই সহজ হইয়া আসে। এই প্রত্যক্ষীকরণের জন্যই উপমাদি অলঙ্কার আঁকিতে থাকে ছবির উপর ছবি। এমন কি সাধারণ চিত্তবৃত্তিকেও আমরা যখন একটা বাস্তব চিত্রের ভিতর দিয়া রূপ দিতে পারি তখনই তাহা আমাদের নিকট সবচেয়ে বেশী স্পষ্ট হইয়া ওঠে।

মানসিক অবস্থা প্রকাশে কালিদাসের উপমা

'অভিজ্ঞান-শকুন্তলে' দেখিতে পাই,—শকুন্তলার সহিত প্রথম সাক্ষাতের পরে রাজা দুষ্যন্তের আর নগরে ফিরিয়া যাইতে ইচ্ছা হইতেছে না; হৃদয় যেন পশ্চাতে আশ্রমবাসিনী শকুন্তলাতেই আকৃষ্ট হইয়া রহিয়াছে, অথচ শরীরটিকে লইয়া আগাইয়া চলিতে হইতেছে। মনের এই প্রতিকূল অবস্থাটিকে কালিদাস একটি মাত্র উপমার সাহায্যে বুঝাইলেন—

গচ্ছতি পুরঃ শরীরং ধাবতি পশ্চাদসংস্থিতং চেতঃ।
চীনাংশুকমিব কেতোঃ প্রতিবাতং নীয়মানস্য ॥

শরীর অগ্রের দিকে চলিয়াছে,—অসংস্থিত চিত্ত পশ্চাতের দিকে ধাবিত হইতেছে,—ঠিক যেন একটি অগ্রে নীয়মান পতাকার সূক্ষ্ম রেশমী বস্ত্র প্রতিকূল বাতাসে চালিত হইতেছে। নবপ্রণয়াসক্ত মনের প্রতিটি সূক্ষ্ম স্পন্দন যেন ঐ প্রতিকূল বাতাসে নীয়মান চীনাংশুকের প্রতিটি কম্পনে আমাদের নিকটে ধরা পড়িয়াছে।

পঞ্চম অঙ্কে আর্যা গৌতমী এবং শার্ঙ্গরব প্রভৃতি মুনিগণ শকুন্তলাসহ যখন রাজ-সভায় প্রবেশ করিয়া দুষ্যন্তের পূর্ব-

বিবাহিতা পত্নী বলিয়া শকুন্তলার পরিচয় দিলেন, রাজা শকুন্তলাকে চিনিতে পারিলেন না,—কিন্তু শকুন্তলার অনুপম রূপে আকৃষ্ট হইয়া তাহাকে ত্যাগও করিতে পারিতেছিলেন না; শকুন্তলা পূর্ববিবাহিতা পত্নী কিনা স্মরণ না হওয়ায় তাহাকে গ্রহণ করাও যাইতেছে না। রাজার সেই মানসিক অবস্থা ঠিক যেন একটি অন্তস্তুষার কুন্দের চারিপাশে ঘুরিয়া মরা ভ্রমরের মত। কুন্দের অন্তঃস্থিত তুষারের জন্য তাহার বুকের মধুকে ভ্রমর ভোগ করিতেও পারিতেছে না, আবার কুন্দের মধুলোভে আকৃষ্ট ভ্রমর তাহাকে কিছুতেই ত্যাগও করিতে পারিতেছে না। একটা বিস্মৃতির তুষারে যেন শকুন্তলা রূপ কুন্দফুলটির বুক ঢাকা পড়িয়াছে,—তাই তাহাকে গ্রহণ করাও যাইতেছে না,—আবার সেই অনুপম কান্তিমাধুর্যকে যেন ত্যাগ করাও যাইতেছে না।

ইদমুপনতমেবং রূপমাক্লিষ্টকান্তি
প্রথমপরিগৃহীতং স্যান্নবেতি ব্যবস্যন্।
ভ্রমর ইব বিভাতে কুন্দমন্তস্তুষারঃ
ন চ খলু পরিভোক্তুং নৈব শক্নোমি হাতুম॥

স্মারক অঙ্গুরী পাইয়া শকুন্তলা-বিরহে কাতর দুষ্যন্ত বিদূষককে বলিতেছেন,—শকুন্তলার সহিত আমার সমাগম স্বপ্ন কি মায়া অথবা মতিভ্রম—কিছুই বুঝিতে পারিলাম না,—অথবা সে সমাগম যেন পরিক্ষীণ কিঞ্চিৎ পুণ্যের ফল মাত্র; সেই শকুন্তলা আর ফিরিবে না, সমস্তই এখন অতীত,—আর

শকুন্তলা সম্বন্ধে আমার সকল মনোরথই এখন তট-প্রপাতের মত।

স্বপ্নো নু মায়া নু মতিভ্রমো নু
ক্লিষ্টং নু তাবৎফলমেব পুণ্যম্।
অসন্নবৃত্ত্যৈ তদতীতমেতে
মনোরথা নাম তটপ্রপাতা॥

প্রতিকূল স্রোতের আঘাতে তটভূমি যেমন একটির পরে একটি করিয়া ভাঙিয়া পড়ে, শকুন্তলা সম্বন্ধে সকল অভিলাষও এখন তেমনই একটার পর একটা ভাঙিয়া পড়িবে।

এই নাটকেরই শেষের দিকে দেখিতে পাই,—রাজা দুষ্যন্ত মহর্ষি মারীচের নিকট বলিতেছেন,—আমি শকুন্তলাকে দেখিয়া, তাহার মুখে সকল পূর্বকাহিনী শুনিয়াও কিছুই স্মরণ করিতে পারিলাম না, শেষে অঙ্গুরী দর্শনে আমার সকল স্মৃতি ফিরিয়া আসিল। ঠিক যেন,—

যথা গজো নেতি সমক্ষরূপে
তস্মিন্নতিক্রামতি সংশয়ঃ স্যাৎ।
পদানি দৃষ্ট্বা তু ভবেৎ প্রতীতি-
স্তথাবিধো মে মনসো বিকারঃ॥

হাতীটি যখন সমক্ষে আসিল তখন মনে হইল ইহা হাতী নয়; সে যখন অতিক্রম করিয়া চলিয়া গেল, তখন মনে সংশয় আসিল; তারপরে পদচিহ্ন দেখিয়া প্রতীতি জন্মিল যে ইহা হাতী!—আমার মনের বিকারও ঠিক সেইরূপ। হাতীটিকে সম্মুখে দেখিয়া চিনিলাম না,—শুধু পদচিহ্ন দেখিয়া চিনিলাম,—যে

সম্মুখ হইতে চলিয়া গিয়াছে সে একটি হাতী! সমক্ষে আসিয়া রাজসভায় সেই শকুন্তলা দাঁড়াইয়াছিল,—কত পূর্ব-পরিচয় দিয়াছিল,—কিছুতেই সেদিন তাহাকে চিনিলাম না, কিন্তু পরে তাহাকে চিনিলাম হাতের আঙটিটি দেখিয়া!

মহর্ষি মারীচের আশ্রমে ধৃতৈকবেণী তপস্বিনী শকুন্তলার পদতলে পড়িয়া দুষ্যন্ত বলিয়াছিলেন,—

সুতনু হৃদয়াৎ প্রত্যাদেশ-ব্যলীকমপৈতু তে
কিমপি মনসঃ সম্মোহো মে তদা বলবানভূৎ।
প্রবলতমসামেবংপ্রায়াঃ শুভেষু হি বৃত্তয়ঃ
স্রজমপি শিরস্যন্ধঃ ক্ষিপ্তাং ধুনোত্যহি-শঙ্কয়া॥

হে সুতনু, প্রত্যাখ্যান-জনিত দুঃখ এবং ক্ষোভ হৃদয় হইতে দূর করিয়া দাও,—তখন কি জানি কি একটা সম্মোহ আমার মনে বলবান হইয়া উঠিয়াছিল। প্রবল তমসাচ্ছন্ন ব্যক্তিদের শুভকার্যে এইরূপই মনের অবস্থা হইয়া থাকে,—অন্ধের মাথায় কুসুমের মালা জড়াইয়া দিলেও সে সর্প-আশঙ্কায় দূরে ছুড়িয়া ফেলে।

'মেঘদূতে'র ভিতরে বিরহী যক্ষ মেঘকে বলিতেছে,—

তাঞ্চাবশ্যং দিবসগণনাতৎপরামেকপত্নী-
মব্যাপন্নামবিহতগতির্দ্রক্ষ্যসি ভ্রাতৃজায়াম্।
আশাবন্ধঃ কুসুম-সদৃশং প্রায়শো হ্যঙ্গনানাং
সদ্যঃপাতি প্রণয়ি হৃদয়ং বিপ্রয়োগে রুণদ্ধি॥ (পূ।১০)

হে মেঘ, অবাধগতিতে চলিয়া গিয়া তোমার পতিব্রতা ভ্রাতৃ-

বধূকে দেখিতে পাইবে; সে এখন পর্যন্ত জীবিতই আছে,—এবং আমার জন্য দিবস গণনায় ব্যাপৃত আছে। বৃন্ত যেন পতনোন্মুখ পুষ্পকেও মাটিতে ঝরিয়া পড়িতে দিতে চাহে না,—ওই বৃন্তের সহিত এবং পতনোন্মুখ পুষ্পের সহিত রহিয়াছে যে একটি দৃষ্টি-মনের অগোচর রহস্যময় সম্বন্ধ, তাহাই যেন বিরহি-হৃদয়ের আশার রূপ।

'কুমার-সম্ভবে' দেখিতে পাই, মহাদেব বটু ব্রাহ্মণের ছদ্ম-বেশে আসিয়া কঠোর তপস্যারত উমাকে তপস্যা হইতে প্রতি-নিবৃত্ত করিবার জন্য প্রচুর শিবনিন্দা করিতেছেন। উমা প্রথমে বহু প্রতিবাদ করিয়াছে, কিন্তু প্রগল্ভ চপল ব্রাহ্মণ কিছুতেই নিরস্ত হইতেছে না দেখিয়া সেখান হইতে উমা অন্যত্র চলিয়া যাইবার উপক্রম করিল; কিন্তু বেগবশে তাহার স্তন-বল্কল খসিয়া গেল, মহাদেব তখন নিজমূর্তি পরিগ্রহ করিয়া সহাস্যে উমাকে ধারণ করিলেন। তখন,

> তং বীক্ষ্য বেপথুমতী সরসাঙ্গযষ্টি-
> র্নিক্ষেপণায় পদমুদ্ধৃতমুদ্বহন্তী।
> মার্গাচল-ব্যতিকরাকুলিতেব সিন্ধুঃ
> শৈলাধিরাজতনয়া ন যযৌ ন তস্থৌ॥ (৫।৮৫)

মহাদেবকে সম্মুখে দেখিয়া ঘর্মাক্তকলেবরা কম্পান্বিতা গিরি-রাজনন্দিনী অগ্রে নিক্ষেপের জন্য চরণ ঊর্ধ্বে উত্তোলন করিয়া আর যেন যাইতেও পারিল না, থাকিতেও পারিল না,—ন যযৌ ন তস্থৌ। ঠিক যেন পথমধ্যে পর্বতের দ্বারা প্রতিরুদ্ধ-

গতি একটি ব্যাকুলা নদী। উমার অন্তরের যুগপৎ প্রবাহিত ক্রোধ, আনন্দ, লজ্জা এবং সঙ্কোচ সে যেন কাহাকেও প্রকাশও করিতে পারিতেছে না, রুধিয়া রাখিতেও পারিতেছে না, সম্মুখে দাঁড়াইয়া মহেশ্বর কল-প্রবাহিতা সিন্ধুর মুখে অচল পাষাণ-স্তূপের ন্যায়। উমার যে শুধু বাহিরের গতিতেই বাধা পড়িয়াছে তাহা নহে, বাধা পড়িয়াছে তাহার অন্তরের প্রবাহেও, তাই পর্বত-প্রতিরুদ্ধা নদীর ন্যায় গিরিরাজসুতা 'ন যযৌ ন তস্থৌ।' সহসা পর্বতের দ্বারা প্রতিরুদ্ধগতি নদী যেমন আর সম্মুখে অগ্রসর হইতে না পারিয়া অন্তর্বেগে শুধু আপনার ভিতরে উপছাইয়া উঠিতে থাকে, গিরিরাজ-সুতা উমার তেমনই অন্তর্নিবদ্ধ ভাব-সম্বেগ শুধু যেন উপছাইয়া উঠিতেছিল।

'মালাবিকাগ্নিমিত্রে'র ভিতরে দেখিতে পাই, বিদূষক যখন অদূরে দণ্ডায়মানা মালাবিকার সন্ধান বলিল, তখন রাজা বলিলেন,

> ত্বদুপলভ্য সমীপগতাং প্রিয়াং
> হৃদয়মুচ্ছ্বসিতং মম বিক্লবম্।
> তরুবৃতাং পথিকস্য জলার্থিনঃ
> সরিতমারসিতাদিব সারসাৎ॥

তোমার নিকটে সমীপগতা প্রিয়ার কথা শুনিয়া আমার কাতর হৃদয় আবার উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছে, ঠিক যেন পিপাসার্ত জলান্বেষী পথিকের পক্ষে সারসের রবে সমীপবর্তী সমাবৃত জলাশয়ের সন্ধান লাভের মত!

'বিক্রমোর্বশী'তে দেখি মূর্ছাভঙ্গের পর উর্বশীর বরতনু যেন তট-পতন-কলুষা গঙ্গার পুনরায় প্রশান্ত মূর্তি।

মোহেনান্তর্বরতনুরিয়ং লক্ষ্যতে মুচ্যমানা
গঙ্গা রোধঃপতনকলুষা গচ্ছতীব প্রসাদম্ ॥

আবার উর্বশী যখন আকাশে অন্তর্হিত হইল তখন রাজা বিক্রম বলিতেছেন,

এষা মনো মে প্রসভং শরীরাৎ
পিতুঃ পদং মধ্যমমুৎপতন্তী।
সুরাঙ্গনা কর্ষতি খণ্ডিতাগ্রাৎ
সূত্রং মৃণালাদিব রাজহংসী ॥

সুরাঙ্গনা উর্বশী আমার দেহ হইতে মনটিকে ঠিক তেমনি করিয়াই টানিয়া লইতেছে, যেমন করিয়া রাজহংসী টানিয়া লয় সূক্ষ্ম মৃণাল-সূত্রগুলি খণ্ডিতাগ্র মৃণালের ভিতর হইতে।

'রঘুবংশে'র ভিতরে দেখি, একটি সুরাঙ্গনা যখন হরিণীর রূপ ধরিয়া তাহার কামোদ্দীপক বিলাস-বিভ্রমে তপোমগ্ন ঋষির চিত্ত-চাঞ্চল্য ঘটাইয়া তপস্যার বিঘ্নোৎপাদন করিবার চেষ্টা করিতেছিল, তখন তপঃপ্রভাবে ঋষি সকলই জানিতে পারিলেন এবং তাঁহার ধ্যান-সমাহিত প্রশান্ত চিত্তে সহসা ক্রোধের উদ্রেক হইল, ঋষি তাহাকে শাপ দিলেন। তপোমগ্ন ঋষির যোগ-সমাহিত চিত্তে এই তপোভঙ্গজনিত ক্রোধের বিক্ষেপ যেন প্রশান্ত সাগর-বেলায় প্রলয়ের তরঙ্গাঘাত।

স তপঃপ্রতিবন্ধমন্যুনা
প্রমুখাবিষ্কৃতচারুবিভ্রমাম্।
অশপদ্ভব মানুষীতি তাং
শমবেলা-প্রলয়োর্মিণা ভুবি ॥ (৮।৮০)

'রঘুবংশে'র অন্যত্র দেখিতে পাই, অভিশাপমুক্ত গন্ধর্ব-কুমার রাজা অজকে বলিতেছে,

স চানুনীতঃ প্রণতেন পশ্চাৎ
ময়া মহর্ষির্মৃদুতামগচ্ছৎ।
উষ্ণত্বমগ্ন্যাতপসংপ্রয়োগাৎ
শৈত্যং হি যৎ সা প্রকৃতির্জলস্য ॥ (৫।৫৪)

আমি প্রণত হইয়া পরে যখন মহর্ষির নিকটে অনুনয় করিলাম তিনি মৃদুতা অবলম্বন করিয়া আমার প্রতি প্রসন্ন হইলেন; জলের যে উষ্ণত্ব তাহা অগ্নি-সংযোগেই ঘটিয়া থাকে, কিন্তু শীতলতাই জলের প্রকৃতি। এখানে স্বভাব-শীতল তপস্বি-প্রকৃতিটি আমাদের স্পর্শযোগ্য হইয়া উঠিয়াছে।

আকাশগামী নারদের বীণা হইতে চ্যুত দিব্য মালা স্পর্শে অচেতনা ইন্দুমতীকে কোলে স্থাপন করিয়া রাজা অজ বলিতেছেন,

তদপোহিতুমর্হসি প্রিয়ে
প্রতিবোধেন বিষাদমাশু মে।
জ্বলিতেন গুহাগতং তমঃ
তুহিনাদ্রেরিব নক্তমোষধিঃ ॥ (৮।৫৪)

হে প্রিয়ে, তুমি তোমার চেতনার উজ্জীবনের দ্বারা এখনই আমার সমস্ত বিষাদ দূর করিয়া দিতে পার; যেমনভাবে রজনীতে ওষধি সহসা প্রজ্বলনের দ্বারা হিমালয়ের গুহাগত তমোরাশি মুহূর্তে দূর করিয়া দেয়।

ত্রয়োদশ সর্গে সীতাকে পাশে করিয়া বিমানপথে অযোধ্যার অভিমুখে ফিরিবার কালে শ্রীরামচন্দ্র সীতাকে বলিতেছেন,—

> ক্বচিৎ পথা সঞ্চরতে সুরাণাং
> ক্বচিদ্ ঘনানাং পততাং ক্বচিচ্চ।
> যথাবিধো মে মনসোঽভিলাষঃ
> প্রবর্ততে পশ্য তথা বিমানম্॥ (১৩।১৯)

হে সীতা, আমাদের এই বিমান কখনও আকাশে দেবতাগণের পথে চলিতেছে,—কখনও মেঘের পথে চলিতেছে,—কখনও আবার বিহঙ্গমগণের বিচরণ পথে; আজ আমার মনের অভিলাষগুলি যেমন করিয়া ঘুরিয়া বঙ্কিমগতিতে চলিতেছে,—তেমনিতর ভাবে ছুটিয়া চলিয়াছে আমাদের বিমানটিও। আজ সীতা উদ্ধার করিয়া চতুর্দশবর্ষ পরে তাহাকেই পাশে রাখিয়া রামচন্দ্র অযোধ্যার অভিমুখে চলিয়াছেন,—তাহার বঙ্কিমগতিতে বহু পথে ঘুরিয়া ফেরা অভিলাষগুলি যেন বাস্তবরূপ পরিগ্রহ করিয়াছে ঐ বহুপথে বিচরণকারী বিমানটির ভিতরে।

যাহাকে আমরা সাধারণত বস্তু-বিয়োজিত গুণ বলিয়া একেবারে রূপ-বর্ণহীন বলিয়া মনে করি, তাহাদের বাহিরে কোন রূপ বা বর্ণ নাই সত্য, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে আমাদের মনের ভিতরে

তাহাদেরও রূপ এবং বর্ণ থাকে। অনেক স্থানে অবশ্য এই সকল গুণের রূপ বা গুণ দ্রব্যান্তরিত-বিশেষণ মাত্র (transferred epithet)। যেমন আমাদের বিষাদমগ্ন মুখের ম্লানিমা লইয়া আমাদের দুঃখের রূপ কালো হইয়া উঠিয়াছে,—আমাদের ব্রীড়ারক্তিম মুখের রাঙিমা মাখিয়া লজ্জা নিজেই যেন লাল হইয়া উঠিয়াছে,—আমাদের আনন্দোজ্জ্বল মুখকান্তির সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়া আমাদের হাসি শুভ্রবর্ণ ধারণ করিয়াছে। সংস্কৃত আলঙ্কারিক মতে যাহা 'কবি-সময়' বলিয়া উল্লেখিত হইয়াছে তাহা অনেকক্ষেত্রেই এই দ্রব্যান্তরিত বিশেষণ। 'রঘুবংশে'র ভিতরে দেখিতে পাই, রাজকুমার অজ প্রতিদ্বন্দ্বী রাজন্যবর্গকে পরাস্ত করিয়া দিয়া বিজয় শঙ্খ বাজাইয়া দিলেন। কবি বলিতেছেন,—রাজকুমার যখন বিজয়বার্তা ঘোষণা করিবার জন্য নিজের অধরোষ্ঠ শুভ্র শঙ্খের মুখে ন্যস্ত করিলেন, তখন মনে হইতেছিল,—বীর কুমার যেন স্বহস্তোপার্জিত মূর্ত যশোরাশিকেই পান করিতেছিলেন।—

উপমায় বস্তু-বিয়োজিত গুণের রূপ ও বর্ণ

ততঃ প্রিয়োপাত্তরসেঽধরোষ্ঠে
নিবেশ্য দধ্মৌ জলজং কুমারঃ।
তেন স্বহস্তার্জিতমেকবীরঃ
পিবন্ যশো মূর্তমিবাবভাসে॥ (৭।৬৩)

শ্বেতবর্ণের শঙ্খটি যেন মূর্ত শুভ্র যশোরাশি! শুধু যে এইখানে উৎপ্রেক্ষাটির সকল মাধুর্য তাহা নহে; একটু ভাবিয়া দেখিলেই

দেখা যাইবে, রাজকুমার অজের যশোরাশি যেমন একটি ধবল শঙ্খে মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে, তেমনি অজের শৌর্য-বীর্যের অনেকখানি প্রকাশ যেন এই একটিমাত্র উৎপ্রেক্ষার ভিতরে জমাট বাঁধিয়া উঠিয়াছে। 'রঘুবংশে'র দ্বিতীয় সর্গেও দেখিতে পাই, বশিষ্ঠের আশ্রমে বশিষ্ঠের আদেশ পাইয়া অতিতৃষ্ণ রাজা দিলীপ নন্দিনীর বৎসের পীতাবশিষ্ট দুগ্ধ পান করিয়া তৃষ্ণা নিবারণ করিলেন। নন্দিনীর সেই শুভ্র দুগ্ধধারা পান করিয়া রাজা যেন মূর্ত যশোরাশিকেই পান করিলেন।

স নন্দিনীস্তন্যমনিন্দিতাত্মা
সদ্বৎসলো বৎস-হুতাবশেষম্।
পপৌ বশিষ্ঠেন কৃতাভ্যনুজ্ঞঃ
শুভ্রং যশো মূর্তমিবাতিতৃষ্ণঃ॥ (২।৬৯)

'রঘুবংশ' চতুর্থ সর্গে দেখিতে পাই,—বীরকেশরী রঘুরাজ শরতের সমাগমে বিজয়-অভিযান করিয়াছেন। তখন,—

হংসশ্রেণীষু তারাসু কুমুদ্বৎসু চ বারিষু।
বিভূতয়স্তদীয়ানাং পর্যস্তা যশসামিব॥ (৪।১৯)

শ্বেত হংসমালা, শ্বেত নক্ষত্ররাজি, শুভ্র কুমুদ পুষ্প, শরতের শুভ্র জলরাশি,—সকলের ভিতরে যেন রাজা রঘুর যশোবিভূতিই বিকীর্ণ হইয়া আছে।

কিন্তু আমাদের এই জাতীয় অশরীরী গুণ বা মানসিক ভাবগুলি কখন যে কোন্ বস্তুর সঙ্গে একটা নিত্যসম্বন্ধ হেতু বিশেষরূপ বা বর্ণ পরিগ্রহ করে, তাহা অতি কৌতূহলপ্রদ। সম্পদের

অধিষ্ঠাতৃদেবী লক্ষ্মী রক্তকমলবর্ণা,—বিদ্যার অধিষ্ঠাতৃদেবী সরস্বতী কুন্দেন্দুধবলা। ইহার পশ্চাতে সূক্ষ্ম কারণ রহিয়াছে। সম্পদের ভিতরে আছে যে তরল আনন্দ, যে গর্বান্ধ মত্ততা, যে রজো-গুণের উত্তেজনা সে আমাদের চিত্তকে নাড়া দেয় ঠিক সেই ভাবে, যেভাবে রক্ত-কমলবর্ণ আমাদের চিত্তে দেয় স্পন্দন। আবার জ্ঞানের ভিতরে যে স্বচ্ছতা, যে বিশুদ্ধতা, যে সাত্ত্বিক ঔজ্জ্বল্য—যে গভীর প্রশান্তি রহিয়াছে সে আমাদের চিত্তকে প্রশান্ত করিয়া তোলে ঠিক সেই ভাবে যেভাবে আমাদের চিত্তকে নির্মল প্রশান্তিতে ভরিয়া দেয় কুন্দেন্দুধবল কান্তি। তাই ত দেখি কবি উমার প্রাক্তন বিদ্যার তুলনা করিলেন শরতের গঙ্গায় শুভ্র হংসমালার সঙ্গে আর রজনীতে ওষধির আত্মভাসের সঙ্গে।

উপমা সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গেলে আর একটি জিনিস বেশ সহজে চোখে পড়ে যে, আমরা সাধারণ বা সামান্য (General) সত্যকে খুব স্পষ্ট করিয়া বুঝিয়া উঠিতে পারি না যতক্ষণ তাহাকে বিশেষের ভিতর প্রত্যক্ষ করিয়া না পাই।

‘সামান্য’ হইতে ‘বিশেষে’ চিন্তার প্রসাদ

যে দুর্জ্ঞেয় তত্ত্বের ঘনজালের ভিতরে মন একেবারে নিরুদ্ধ হইয়া ওঠে,—সে যেন মুক্তি পায় ছোট্ট একটি উপমার ভিতর দিয়া। ইহার কারণ, মানুষ ‘বিশেষ’ হইতে বিয়োজিত ‘সামান্য’ লইয়া চিন্তা করিতে অভ্যস্ত নহে; এই মানসিক বিয়োজনের (Abstraction) ভিতরেই আছে মনের উপরে

একটা বল-প্রয়োগ,—যাহা সাধারণ মনের পক্ষে ক্লেশ-সাধ্য। এই জন্যই সামান্য হইতে বিশেষে গিয়া শুধু আমাদের বোঝা জিনিসটিই যে সহজ হইয়া ওঠে তাহা নয়,—'বোঝন'-ক্রিয়ার এই সহজত্বের ভিতর দিয়া আসিয়া পড়ে একটা সুখময়ত্ব—একটা হ্লাদ-জনকতা,—এই জন্যই তুলনা, উদাহরণ বা সমর্থন ব্যতীত আমাদের মন যেন কিছুই বুঝিয়া আরাম পায় না,—তাই সে বুঝিতেও চাহে না। আবার 'বিশেষ' সম্বন্ধে সম্যক্ প্রতীতি লাভ করিতে হইলে আমাদিগকে 'বিশেষ' সমূহ হইতে লব্ধ যে 'সামান্য' তাহারই দ্বারস্থ হইতে হয়, সেই 'সামান্যে'র সমর্থনে 'বিশেষে'র সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান স্পষ্টতর হইয়া ওঠে। এই জন্য আমাদের চিন্তার ভিতরে থাকে 'সামান্য' হইতে 'বিশেষে' এবং 'বিশেষ' হইতে 'সামান্যে' একটা নিরন্তর আসা-যাওয়া। পূর্বেই বলিয়াছি, এই জাতীয় 'বিশেষ' দ্বারা 'সামান্য'কে বা 'সামান্য' দ্বারা 'বিশেষ'কে, 'কারণ' দ্বারা 'কার্য'কে অথবা 'কার্য'-দ্বারা 'কারণ'কে সমর্থন করাকে আলঙ্কারিকগণ 'অর্থান্তরন্যাস' নামে অভিহিত করিয়াছেন। কালিদাস অনেক সময়ে তাঁহার অলঙ্কার প্রয়োগের ভিতর দিয়া 'সামান্য'কে এইরূপে 'বিশেষে'র মধ্যে সুস্পষ্ট করিয়া তুলিয়াছেন, আবার 'বিশেষ'কেও 'সামান্যে'র ভিতরে প্রকাশ করিয়া তুলিয়াছেন। 'কুমার-সম্ভবে'র প্রারম্ভে কবি বলিতেছেন যে, অনন্ত রত্ন প্রসবকারী হিমালয়ের তুষার ইহার সৌন্দর্য-বিলোপী হইয়া ওঠে নাই ; কেননা বহু গুণের মধ্যে একটি দোষ ডুবিয়া যায়,—যেমন চন্দ্রকিরণ-রাশির ভিতরে তাহার কলঙ্ক-চিহ্ন।

অনন্ত-রত্ন-প্রভবস্য যস্য
হিমং ন সৌভাগ্যবিলোপি জাতম্।
একো হি দোষো গুণসন্নিপাতে
নিমজ্জতীন্দোঃ কিরণেষ্বিবাঙ্কঃ॥ (১।৩)

এখানে দেখিতেছি, প্রথমত 'হিম যে অনন্তরত্ন-প্রসূ হিমালয়ের সৌন্দর্য-বিলোপি হইতে পারে নাই' এই 'বিশেষ'কে সমর্থন করা হইল 'একদোষ গুণসমূহের মধ্যে ডুবিয়া যায়' এই 'সামান্য' দ্বারা; আবার এই 'সামান্য'কে সমর্থন করা হইয়াছে দ্বিতীয় একটি 'বিশেষে'র সাহায্যে—'চন্দ্রের কিরণ সমূহের ভিতরে তাহার কলঙ্ক চিহ্ন যেমন ডুবিয়া যায়'।

'মালাবিকাগ্নিমিত্রে'র ভিতরে দেখিতে পাই,—মালবিকা গুরুর উপদিষ্ট অভিনয়াদি শিল্পকলায় অতি নিপুণা হইয়াছে। গুরু গণদাস বলিতেছেন,—

পাত্রবিশেষে ন্যস্তং গুণান্তরং ব্রজতি শিল্পমাধাতুঃ।
জলমিব সমুদ্রশুক্তৌ মুক্তাফলতাং পয়োদস্য॥

শিল্পশিক্ষকের শিক্ষা যদি পাত্র বিশেষে ন্যস্ত হয় তবে তাহা বহুগুণে বৃদ্ধি পায়; মেঘের জল যেমন সমুদ্র-শুক্তির মধ্যে পতিত হইলেই মুক্তা ফল হইয়া ওঠে।

অন্যত্র রাজা অগ্নিমিত্র বিদূষককে বলিতেছেন,—

অর্থং সপ্রতিবন্ধং প্রভুরধিগন্তুং সহায়বানেব।
দৃশ্যং তমসি ন পশ্যতি দীপেন বিনা সচক্ষুরপি॥

উপযুক্ত সহায় থাকিলেই প্রভু বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও নিজের অভিপ্রায় সাধন করিতে পারেন; প্রদীপ না থাকিলে চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তিও অন্ধকারে দৃশ্য বস্তুকে দেখিতে পারে না। 'রঘুবংশে'র অজবিলাপের ভিতরে দেখিতে পাই,—

অথবা মৃদু বস্তু হিংসিতুং
মৃদুনৈবারভতে প্রজান্তকঃ।
হিমসেকবিপত্তিরত্র মে
নলিনী পূর্ব-নিদর্শনং মতা॥ (৮।৪৫)

অথবা প্রজান্তক কাল মৃদু বস্তুকে মৃদুবস্তু দ্বারাই ধ্বংস করে; শিশির সম্পাতে কমলের বিনাশই ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

কালিদাসের উপমায় মৌলিকতা ও শুচিতা

কালিদাসের উপমার প্রধান মাহাত্ম্য তাহার বৈচিত্র্যে এবং মৌলিকতায়। কবি নিজের কল্পনাকে সীমাবদ্ধ কোন রাজপথ দিয়া চালাইয়া যান নাই। উত্তুঙ্গ পর্বত, দুর্গম অরণ্যানী, সীমাহীন বারিধি, বিরাট আকাশ, বন্ধনহীন বায়ু, তরুলতা, ফলফুল, পশুপক্ষী—মানুষ, তাহার জীবন, তাহার স্নেহ-প্রেম, শৌর্য, বীর্য, শিল্প-জ্ঞান, যাগ-যজ্ঞ, ধর্ম-কর্ম সমস্ত লইয়া বিশ্ব-সৃষ্টি যেন তাহার বিপুল সমগ্রতার ভিতরে একটা বিশেষ রূপ লইয়া কবির বাসনা রাজ্যে আশ্রয় লইয়াছিল। জগৎকে এবং জীবনকে তিনি একটা স্বতন্ত্র দৃষ্টিতে বিশেষ করিয়া দেখিয়াছেন, বিশেষ করিয়া অনুভব করিয়াছেন। সেই সকল দেখা, সকল অনুভূতিই আবার কাব্যে রূপ পাইয়াছে সমগ্রতার

বৈচিত্র্যে। প্রকৃতির ভিতর দিয়া তিনি এমন ছবিও অনেক আঁকিয়াছেন যাহাকে আজকালকার দিনে আমরা আর একটু যবনিকান্তরালে ঢাকিয়া রাখিয়া কথা বলিতে চাই; যাহার অনেকগুলিকে তাহার সকল চমৎকারিত্ব এবং সার্থকতা সত্ত্বেও আমরাই সাধারণ সমাজে ধরিয়া দেখাইতে কুণ্ঠিত। কিন্তু অন্যদিকে আবার তাঁহার চিন্তার মঙ্গলময় শুভ্রতা—তাঁহার উচ্চ আধ্যাত্মিক সুর আমাদিগকে শ্রদ্ধাবনত করিয়া দেয়। উদারার নিম্নতম ঘাটে সুর বাঁধিয়া মুদারা অতিক্রম করিয়া তারার সর্বশেষ ঘাটে সুর পৌঁছাইতেও কবিকে যেন কোথাও একটা বেগ পাইতে হয় নাই। এই ওঠা-নামার ভিতরে কৃত্রিমতা নাই,—সকল জিনিসটাই যেন তাঁহার নিকটে ছিল অতি সহজসাধ্য—সর্বত্র রহিয়াছে একটা সাবলীল ছন্দ।

'মালাবিকাগ্নিমিত্রে'র ভিতরে রাজ্ঞী ধরণী যখন সন্ন্যাসিনী কৌশিকী সহ শোভা পাইতেছিলেন তখন রাজা বলিতেছেন,—

মঙ্গলালঙ্কৃতা ভাতি কৌশিক্যা যতিবেষয়া।
ত্রয়ী বিগ্রহবত্যেব সমমধ্যাত্মবিদ্যয়া॥

মঙ্গল অলঙ্কারে ভূষিতা রাণীর পার্শ্বে যতিবেশ-ধারিণী কৌশিকীকে দেখিয়া মনে হইতেছে বিগ্রহবতী ত্রিগুণাত্মিকা বেদবিদ্যা যেন অধ্যাত্মবিদ্যার সহিত শোভা পাইতেছে। রাণী নিজেও মঙ্গলালঙ্কৃতা,—তাহার সম্পদের সহিত রাজশক্তির সহিত যোগ হইয়াছে মাঙ্গল্যের,—তাই তিনি ত্রিগুণাত্মিকা বেদবিদ্যা; সন্ন্যাসিনী কৌশিকী বিগ্রহবতী বেদান্তবিদ্যা। ইহার পরে দেখিতে

পাই পরিব্রাজিকা কৌশিকী রাজাকে আশীর্বাদ করিতেছেন,—

মহাসারপ্রসবয়োঃ সদৃশক্ষময়োর্দ্বয়োঃ।
ধারিণী-ভূতধারিণ্যোর্ভব ভর্তা শরচ্ছতম্॥

ভূতধাত্রী বসুন্ধরা যেমন বহুমূল্য রত্নপ্রসবা,—সে যেমন সর্বক্ষমা —তেমনি বীরপুত্র প্রসবিনী এবং ধরিত্রীর মত সহনশীলা তোমার এই রাণী 'ধরণী'; তুমি শতবৎসর কাল এই উভয়ের ভর্তা হইয়া জীবিত থাক। ধরিত্রীর মতন রত্ন-গর্ভা এবং ধরণীর মত সহনশীলা রাণীমূর্তিখানি যেন একটা অনির্বচনীয় মহিমায় দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে।

'রঘুবংশে'র ভিতরে দেখিতে পাই, সাধ্বী রমণীগণের অগ্রগণ্যা, মহারাজ দিলীপের ধর্মপত্নী সুদক্ষিণা হোমধেনু নন্দিনীর পবিত্র পাদস্পর্শে পূত ধূলিময় পথে নন্দিনীকে অনুসরণ করিয়া চলিয়াছে; মনে হয়, মূর্তিমতী স্মৃতি যেন মূর্তিমতী শ্রুতির অর্থরূপ পথকে অনুসরণ করিতেছে।

তস্যাঃ খুরন্যাস-পবিত্রপাংশু-
মপাংশুলানাং ধুরি কীর্তনীয়া।
মার্গং মনুষ্যেশ্বর-ধর্মপত্নী
শ্রুতেরিবার্থং স্মৃতিরন্বগচ্ছৎ॥ (২।২)

রাণী সুদক্ষিণাকে সাক্ষাৎ শ্রুতির অনুগামিনী স্মৃতি বলিয়া অভিহিত করিতে হইলে কি ভাবে যে রাণীকে আনিয়া চোখের সম্মুখে ধরিতে হয় তাহা কালিদাসের জানা ছিল; তাই পূর্বাহ্নে ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া তবে কবি অন্য ছবিটি আঁকিলেন।

সুদক্ষিণা একদিকে 'অপাংশুলানাং ধুরি কীর্তনীয়া'—অন্যদিকে 'মনুষ্যেশ্বর-ধর্মপত্নী',—তাই সে রাণী নন্দিনীর পশ্চাতে সাক্ষাৎ স্মৃতিস্বরূপিণী। হোমধেনু নন্দিনী সম্বন্ধে দেখিতে পাই,—

তাং দেবতাপিত্রতিথি-ক্রিয়ার্থা-
মন্বগ্ যযৌ মধ্যমলোকপালঃ।
বভৌ চ সা তেন সতাং মতেন
শ্রদ্ধেব সাক্ষাদ্ বিধিনোপপন্না॥ (২।১৬)

পৃথিবীপালক দিলীপ দেবতালোক, পিতৃলোক এবং অতিথি-গণের প্রতি কর্তব্য-সাধনের সহায়রূপিণী নন্দিনীর পশ্চাতে পশ্চাতে চলিতেছিলেন; সজ্জনের নিকটেও সম্মানার্হ রাজা দিলীপ কর্তৃক অশেষ শ্রদ্ধা সহকারে সেব্যমানা গাভীটিকে মনে হইতেছিল যেন সজ্জনগণের মত-সম্মত বিধির সহিত শোভমানা সাক্ষাৎ শ্রদ্ধা।

মহারাণী কুমুদ্বতী মহারাজ কুশ হইতে একটি পুত্র লাভ করিল; কবি বলিলেন, রাণীর এই পুত্রলাভ যেন শেষরজনীর কাছ হইতে মানুষের প্রসন্ন চেতনা লাভ।

অতিথিং নাম কাকুৎস্থাৎ পুত্রং প্রাপ কুমুদ্বতী।
পশ্চিমাদ্ যামিনীযামাৎ প্রসাদমিব চেতনা॥ (১৭।১)

মহর্ষি বাল্মীকি যখন আশ্রমবাসিনী ব্রহ্মচারিণী সীতা এবং তাহার শিশুপুত্রদ্বয় সহ রাজসভায় রামের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন, তখন মনে হইল, এক পরম ঋষি যেন উদত্তাদিস্বর-বিশুদ্ধিযুক্তা গায়ত্রী সহ উদীয়মান সবিতার সম্মুখীন হইয়াছেন।

স্বরসংস্কারবত্যাসৌ পুত্রাভ্যামথ সীতয়া।

ঋচেবোদর্চিষং সূর্যং রামং মুনিরুপস্থিতঃ॥ (১৫।৭৬)

মহর্ষি বাল্মীকির সহিত শুদ্ধা সীতা যেন মূর্তিমতী গায়ত্রী,—সেই গায়ত্রী-কল্পা জননীর পাশে শিশুপুত্র দুইটি যেন গায়ত্রীর উদাত্তাদির স্বরশুদ্ধি; সম্মুখের রামচন্দ্র যেন উদীয়মান সূর্য। মহর্ষি বাল্মীকির আশ্রিতা সীতার মূর্তি যেন অনির্বচনীয় পবিত্র মহিমায় ভরিয়া উঠিয়াছে।

মহর্ষি মারীচের তপোবনে ধৃতৈকবেণী শকুন্তলা, কুমার সর্বদমন এবং রাজা দুষ্মন্তকে দেখিয়া মহর্ষি মারীচ বলিয়াছিলেন,—

দিষ্ট্যা শকুন্তলা সাধ্বী সদপত্যমিদং ভবান্।

শ্রদ্ধা বিত্তং বিধিশ্চেতি ত্রিতয়ং তৎসমাগতম্॥

সাধ্বী তপস্বিনী শকুন্তলা যেন সাক্ষাৎ শ্রদ্ধা,—রাজা দুষ্মন্ত যেন সাক্ষাৎ বিধি,—আর সেই বিধি এবং পরম শ্রদ্ধার মিলনে জন্ম লাভ করিয়াছে এই সর্বদমন রূপ মূর্তিমান বিত্ত।

'কুমার-সম্ভবে' যোগমগ্ন মহাদেবের বর্ণনায় দেখিতে পাই,—

অবৃষ্টি-সংরম্ভমিবাম্বুবাহ-

মপামিবাধারমনুত্তরঙ্গম্।

অন্তশ্চরাণাং মরুতাং নিরোধা-

ন্নিবাত-নিষ্কম্পমিব প্রদীপম্॥ (৩।৪৮)

অন্তশ্চর প্রাণ-অপানাদি বায়ুসকলকে যোগেশ্বর মহাদেব যোগের দ্বারা নিরুদ্ধ করিয়াছেন,—সেই নিরুদ্ধ-শ্বাস ধ্যান সমাহিত মহাদেব যেন 'অবৃষ্টি-সংরম্ভ অম্বুবাহ'; 'অম্বুবাহ' শব্দের দ্বারা

মেঘের বর্ষণ-ক্ষমত্বকেই স্পষ্ট করা হইয়াছে,—কিন্তু সে অম্বুবাহ যেন 'অবৃষ্টি-সংরম্ভ',—বর্ষণবেগ যেন নিরুদ্ধ হইয়া রহিয়াছে জলভরা মেঘের ভিতরে। আর যোগস্থ মহাদেব যেন তরঙ্গ-হীন বারিধি,—বারিধির বিরাট প্রশান্তির ভিতরে তরঙ্গবেগ যেন নিরুদ্ধ হইয়া রহিয়াছে,—যোগীশ্বর মহাদেব আর যেন নিবাত নিষ্কম্প প্রদীপ !

'রঘুবংশে' দেখিতে পাই, শাস্ত্রজ্ঞ বশিষ্ঠ দ্বারা বিধিমত রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া যুবরাজ অজ অতি দুর্ধর্ষ হইয়া উঠিয়াছিল, কারণ, "ক্ষত্রিয়ের অস্ত্রতেজের সহিত ব্রাহ্মণের ব্রহ্ম-তেজের মিলন ঠিক যেন 'পবনাগ্নিসমাগমো।'" পরিণত বয়সে রাজা রঘু যখন এই যোগ্য রাজকুমারের হাতে রাজ্যভার অর্পণ করিয়া সন্ন্যাস ধর্ম গ্রহণ করিতেছিলেন, তখন—

প্রশমস্থিতপূর্বপার্থিবং
কুলমভ্যুদ্যতনূতনেশ্বরম্ ।
নভসা নিভৃতেন্দুনা তুলা-
মুদিতার্কেণ সমারুরোহ তৎ ॥ (৮।১৫)

একদিকে পূর্বরাজা প্রশমিত,—অন্যদিকে নূতন রাজার অভ্যুদয় ; রাজকুল যেন অস্তমিত প্রায় চন্দ্র এবং উদীয়মান সূর্য লইয়া আকাশের ন্যায় শোভা পাইতেছিল।

বৃদ্ধরাজ রঘু সন্ন্যাসের চিহ্ন ধারণ করিলেন,—যুবরাজ অজ রাজচিহ্ন ধারণ করিলেন ; তাঁহারা যেন পৃথিবীতে ধর্মের 'অপবর্গ' এবং 'অভ্যুদয়' রূপ দুইটি অংশেরই প্রতিমূর্তি।

তারপরে একদিকে যুবরাজ অজ অজিতপদ লাভ করিবার মানসে নীতি বিশারদ মন্ত্রিগণের সহিত মিলিত হইল,—অন্যদিকে বৃদ্ধরাজা রঘু মোক্ষপদ প্রাপ্তির জন্য তত্ত্বদর্শী যোগিগণের সহিত মিলিত হইলেন। একদিকে যুবরাজ অজ প্রজাপুঞ্জের ভাল মন্দ পর্যবেক্ষণের জন্য সিংহাসনে আরোহণ করিল, অন্যদিকে প্রাচীন নৃপতি রঘুও নিজের চিত্তের একাগ্রতা অভ্যাসের জন্য বিজনে পবিত্র কুশাসন গ্রহণ করিলেন। একদিকে রাজকুমার অজ নিজের রাজ্যের নিকটবর্তী সকল রাজন্যবর্গকে নিজের প্রভুশক্তিসম্পদের দ্বারাই বশে আনিল,—অন্যদিকে রঘু সমাধি-যোগের অভ্যাস দ্বারা নিজের শরীরগত পঞ্চ বায়ুকে বশে আনিয়াছিলেন। একদিকে নবীন যুবরাজ অজ শত্রুদিগের সকল প্রতিকূল চেষ্টার ফল ভস্মসাৎ করিয়া দিতে লাগিল,—অন্যদিকে রঘু জ্ঞানময় বহ্নিদ্বারা নিজের সকল কর্মফল ভস্মসাৎ করিয়া দিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সন্ধি-বিগ্রহ প্রভৃতি ছয়টি গুণের ফল চিন্তা করিয়া অজ তাহাদিগকে প্রয়োগ করিতে লাগিল; রঘুও লোষ্ট্র এবং কাঞ্চনে সমদৃষ্টি-সম্পন্ন হইয়া গুণত্রয় জয় করিলেন। স্থিরকর্মা নবীন ভূপতি ফলোদয় না হওয়া পর্যন্ত কর্ম হইতে কিছুতেই বিরত হইতেন না; আর স্থিতধী প্রবীণ নরপতিও পরমাত্ম-দর্শনের পূর্ব পর্যন্ত যোগবিধি হইতে ক্ষান্ত হইলেন না। (৮।১৭-২২)

ইতি শত্রুষু চেন্দ্রিয়েষু চ
প্রতিষিদ্ধ-প্রসরেষু জাগ্রতৌ।

প্রসিতাবুদয়াপবর্গয়ো-
রুভয়ীং সিদ্ধিমুভাববাপতুঃ ॥ (৮।২৩)

এইরূপে তাঁহারা পিতাপুত্রে একে শত্রুর এবং অন্যে ইন্দ্রিয়ের স্বার্থ প্রবৃত্তি নিবারণ করিয়া এবং একে অভ্যুদয় এবং অন্যে অপবর্গের প্রতি আসক্ত হইয়া উভয়েই উভয়ের অনুরূপ সিদ্ধিলাভ করিলেন।

শ্লোক গুলির ভিতর দিয়া কবি মানুষের প্রবৃত্তি এবং নিবৃত্তি ধর্মকে সত্যই যেন কুমার অজ এবং বৃদ্ধ নরপতি রঘুর ভিতরে মূর্ত করিয়া তুলিয়াছেন। একটু লক্ষ্য করিলেই দেখিতে পাইব,—সমস্ত তুলনার ভিতরে রহিয়াছে একটা গুণ কর্মের পরস্পর বিরোধী পার্থক্য। দুই দিকে এই পরস্পর বিরোধী গুণ কর্মগুলিকে সাজাইয়া দিয়া একটা পরস্পর-বৈপরীত্যের ভিতরে দুইটি চিত্রকে অতি স্পষ্ট করিয়া তোলা হইয়াছে।

আমরা কালিদাসের কাব্য-বারিধি হইতে কয়েকটিমাত্র উপমা-রত্ন তুলিয়া দেখাইলাম। কালিদাসের কাব্যে এই জাতীয় উপমাকে বিশেষ করিয়া খুঁজিয়া পাতিয়া বাহির করিতে হয় না,—কাব্য খুলিলেই দুই একটি উপমা আপনিই চোখে পড়িয়া যাইবে। 'রঘুবংশ' লিখিতে আরম্ভ করিয়া কবি কিছুক্ষণ শুধু উপমা দিয়াই কাব্য চালাইলেন। প্রথমে তিনি বাগর্থের ন্যায় নিত্য সংযুক্ত পার্বতী-পরমেশ্বরকে প্রণাম করিলেন,—

উপসংহার

ক্ষুদ্র শক্তি লইয়া বিশাল সূর্যবংশের কাহিনী রচনা-প্রয়াসকে ভেলায় সাগর পার হইবার চেষ্টার সহিত তুলনা করিলেন, মন্দ কবিযশঃপ্রার্থী নিজেকে চন্দ্রলাভের নিমিত্ত উদ্বাহু বামনের ন্যায় উপহাস যোগ্য মনে করিলেন,—পূর্ব সূরিগণ বাল্মীকি প্রভৃতির প্রদর্শিত পথে কাব্য রচনা সম্বন্ধে বলিলেন,—মণৌ বজ্র-সমুৎকীর্ণে সূত্রস্যেবাস্তি মে গতিঃ'—অর্থাৎ বজ্রের (হীরকাদি মণিবেধক) দ্বারা বিদ্ধ কঠিন মণির ভিতরে যেন সূত্রের গতি। বাহিরের জগৎটার সকল দৃশ্য, গন্ধ, গান সকল সময়ের জন্য এমন করিয়া কবির মনের ভিতরে ভিড় করিয়া আছে যে, 'ইব' এবং 'এব' ছাড়া কবি আর কথা বলিতে পারেন না। কিন্তু এই যে তাঁহার সমস্ত কাব্য ভরা শুধু 'ইব' এবং 'এব'র ছড়াছড়ি তাহাতে কখনও মনে হয় না কোথাও কিছু বাড়াবাড়ি হইয়াছে, অথবা কৃত্রিম অলঙ্কার প্রয়োগের আপ্রাণ কসরতের দ্বারা কবি নিজেই ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িতেছেন এবং কাব্যকেও অতিরিক্ত অলঙ্কারভারে একেবারে নিপীড়িত করিয়া তুলিয়াছেন। উপমা-প্রয়োগ কালিদাসের স্বাভাবিক বচন-ভঙ্গি।

আলঙ্কারিকের সূক্ষ্ম-বিচারে কালিদাসের এই সকল উপমা প্রয়োগের ভিতরে হয়ত অনেক গুণের সহিত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম দোষও কিছু কিছু বাহির হইতে পারে। এমন কি মহাদেবের ঈষৎচিত্ত চাঞ্চল্যের দৃশ্যটি সম্বন্ধেও আলঙ্কারিক দৃষ্টিতে এই আপত্তি তোলা যাইতে পারে যে, এখানে একই শ্লোকের ভিতরে দুইটি প্রধান উপমা প্রয়োগ করা হইয়াছে,—একটি চন্দ্রোদয়ের আরম্ভে

অম্বুরাশির সহিত কিঞ্চিৎপরিলুপ্তধৈর্য মহাদেবের তুলনা,—অপরটি উমা মুখের অধরোষ্ঠের সহিত বিম্বফলের তুলনা। আলঙ্কারিকগণের চিকণ বিচারে এখানে এই অভিযোগ আনা যাইতে পারে যে আমাদের মন যুগপৎ দুইটি দৃশ্যের প্রতি আকৃষ্ট হওয়াতে কোন দৃশ্যের রসানুভূতিই সম্পূর্ণ হইয়া উঠিতে পারে না। কিন্তু এ সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই, কালিদাসের উপমার মৌলিকতা, সূক্ষ্মতা, গভীরতা—তাহার বৈচিত্র্য এবং ঔচিত্যের ভিতরে এমন একটা অনির্বচনীয় মহিমায় পাঠকের চিত্ত বিস্মিত, মুগ্ধ এবং চমৎকৃত হইয়া যায় যে, এ সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দোষ যেন মনে আর রেখাপাত করিতে পারে না। আমাদের সাধারণ চক্ষে যে সূর্যকে আমরা শুধু জ্যোতির্মণ্ডল বলিয়া জানি, বৈজ্ঞানিকের দূরবীক্ষণের সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে তাহার ভিতরেও হয়ত কত অন্ধকার রন্ধ্র আবিষ্কৃত হইয়া পড়িতে পারে; গবেষকের সে আবিষ্কার প্রকাণ্ড বৈজ্ঞানিক সত্য হইতে পারে,—কিন্তু আমরা যাহারা প্রভাতে মধ্যাহ্নে এবং সন্ধ্যায় সূর্য-কিরণের বর্ণ-বৈচিত্র্য এবং ঔজ্জ্বল্য দেখিয়া বিস্ময় মানিয়াছি, তাহাদের নিকটে উহা একটা প্রকাণ্ড সত্য নহে। কালিদাসের উপমায় কষ্ট-কল্পনার ক্লিষ্টতা বা বাঁধা-রীতির রসবৈচিত্র্যহীনতা কোথাও নাই এমন কথা বলিতে পারি না,—কিন্তু তাঁহার কাব্যের ভিতরে উহা ঐ সূর্যমণ্ডলের অন্ধকার রন্ধ্রের ন্যায়—পাঠক চিত্তকে তাই সে পীড়িত করে না।

এই সকল উপমা প্রয়োগের ভিতর দিয়া কালিদাসের কাব্যে যে জিনিসটি আমাদের চিত্তকে গভীরভাবে দোলা দেয়,

তাহা কবি প্রতিভার স্বাতন্ত্র্য। সমস্ত কাব্যের ভিতর দিয়া কবির একটা বিশেষ সত্তার একটা অমোঘ স্পর্শ লাভ করি আমরা প্রতিমুহূর্তে। কবি-প্রতিভার স্পষ্টতম পরিচয়ই সেখানে যেখানে কবির ব্যক্তি-পুরুষ তাহার স্পর্শে নিরন্তর সহৃদয় পাঠকের চেতনার ভিতরে আনিতেছে আলোড়ন,—এবং সেই আলোড়নের স্পন্দনে কবির ব্যক্তিপুরুষ নিরন্তর উঠিতেছে পাঠকের হৃদয়ে একান্ত স্পর্শযোগ্য হইয়া। কাব্যের ভিতর দিয়া কবির এই যে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের স্পন্দন,—এই যে তাহার অমোঘ স্পর্শ তাহা কালিদাসের কাব্যকে দান করিয়াছে একটা বিরাট স্বাতন্ত্র্যের মহিমা। কালিদাসের আবির্ভাবের পর বহু শতাব্দী চলিয়া গিয়াছে,—বহু সাহিত্য রচিত হইয়াছে,—কিন্তু আজও মনে হয়, সাহিত্যের দরবারে আপন প্রতিভার গৌরবে কালিদাস যে স্থান অধিকার করিয়া বিরাজ করিতেছেন,—আজও সে আসনের অধিকারী শুধু কালিদাস।

সমাপ্ত